গৌড় ও পাণ্ডুয়া

শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
প্রণীত

প্রকাশক
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৬।১, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
গৌড়নগরের বর্তমান অবস্থা	১
শূলদণ্ড	১১
পেয়াজবাড়ী	১২
রামকেলী ও রূপসনাতন	১৩
বড় সোণামসজিদ বা বারদুয়ারী	১৮
দখল দরজা	২০
ফিরোজ মিনার	২২
লুকোচুরি গেট বা দুর্গের পূর্ব্বদরজা	২৫
কদম রসুল	২৭
চিকা মসজিদ	২৯
বাইশ গজী প্রাচীর	৩০
খাজাঞ্চিখানা	৩২
পিঠাওয়ালীর মসজিদ	৩৩
চামকাটী মসজিদ	৩৩
তাঁতিপাড়া মসজিদ	৩৪
লোটন মসজিদ	৩৫
গুণমন্ত মসজিদ	৩৬
পাঁচখিলানো সাঁকো	৩৬

কোতোয়ালী দরজা	...	৩৭
ঘড়িখানা	...	৩৮
রাজবিবি মসজিদ	...	৩৯
ঝনঝনিয়া মসজিদ	...	৩৯
ছোট সোনা মসজিদ বা খোজাকি মসজিদ	...	৩৯
দরশবাড়ী মসজিদ এবং বিদ্যালয়	...	৪১
কালাপাহাড়ের গড়	...	৪২
সোনারায়ের গড়	...	৪৪
হিন্দু বিগ্রহ ও দেবদেবী মন্দির	...	৪৪
পুরাতন মালদহের প্রাচীন কীর্ত্তি	...	৪৬
পাণ্ডুয়ার বিবরণ	...	৫১
সমাধি	...	৬১
লক্ষ্মণসেন	...	৬৫

চিত্রসূচী

১।	ফিরোজ মিনার।	২২
২।	লুকোচুরি গেট বা গৌড় দুর্গের পূর্ব্বদ্বার।	২৫
৩।	কদম রসূল ও ফতেখাঁর সমাধি গৃহ।	২৭
৪।	ছোট সোনামসজিদ বা খোজাকি মসজিদ।	৩৯
৫।	আদিনা মসজিদ।	৫৮

যাঁহার আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহে

গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রকাশিত

হইল

মালদহ-চাঁচলের সেই

স্বনামধন্য, দানশীল, পরোপকারী ও ধর্ম্মপ্রাণ

রাজা

শ্রীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী

মহাশয়ের করকমলে

কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র পুস্তক উৎসর্গীকৃত হইল

বিনীত—

গ্রন্থকার

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
যায়	যায়	৫	৭
যতদূব	যতদূর	৫	৮
অপরাধি	অপরাধী	৬	৫
পাওয়া	পাওয়া	৮	২০
জীবে	জীব	১৭	৬
সমবে	সময়ে	২৩	১৫
বাজপ্রসাদ	বাজপ্রাসাদ	২৫	১৩
খাজাঞ্চি	খাজাঞ্চি	৩২	৬
এবং	×	৩২	১৭
ensiriptions	inscriptions	৩৪	১৮
গড়বন্দী	গড়বন্দী এবং	৩৭	১০
যাত্রা	যাত্রা	৫৫	১

ভূমিকা।

মালদহ জেলায় অবস্থানকালে আমি ক্রমাগত পাঁচবৎসরকাল গৌড় ও পাণ্ডুয়া অনেকবার পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং বহু দূরদেশ হইতে সমাগত গৌড় ও পাণ্ডুয়া দর্শনেচ্ছু ভদ্র মহোদয়গণের সহিত আমার অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি তাঁহারা এই সমস্ত ভগ্ন অট্টালিকা ও ইষ্টক স্তূপরাশি দেখিয়া ইহার কোনটির কি নাম এবং কোনটি কাহার সময় স্থাপিত হইয়াছিল তাহার কোনরূপ বিবরণ জানিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। এই একটী প্রধান অভাব ও অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া আমি ভদ্র সাধারণের সুবিধার্থে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বর্ত্তমান অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত করিয়া তৎসহ কয়েকখানি চিত্রপট প্রকাশিত করিলাম। যদি ইহা সাধারণের কিঞ্চিৎ মাত্রও উপকারে আইসে তাহা হইলে আমার এই সামান্য পরিশ্রম কতক পরিমাণে সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

এই গ্রন্থের অনেক উপাদান কতকগুলি প্রাচীন পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার মেসার্স জনষ্টন্ এণ্ড হফ্‌ম্যানের (Messrs .Johnston &Hoffmann) নিকট হইতে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার পাঁচখানি ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়া উহার অবিকল প্রতিচ্ছবি এই পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশ করা

হইয়াছে। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ঐতিহাসিক বন্ধু খান্ সাহেব মৌলবী আবিদ আলি খাঁ মহোদয়ের সাহায্যে এবং স্থানীয় ভদ্র সাধারণের নিকট অনেক বিষয় অনুসন্ধান করিয়া আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। মালদহ গৌড়দূত পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক সুসাহিত্যিক কবিরাজ শ্রীযুক্ত লালবিহারি মজুমদার কবিভূষণ এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী মহাশয় আমাকে এই পুস্তক প্রনয়ণের প্রারম্ভ হইতে নানা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজাসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিশেষ যত্নে ও সাহায্যে কলিকাতা সাথী প্রেসে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে। আমি উল্লিখিত ভদ্র মহোদয়গণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতা।
১লা ডিসেম্বর ১৯২০। } শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মানচিত্র
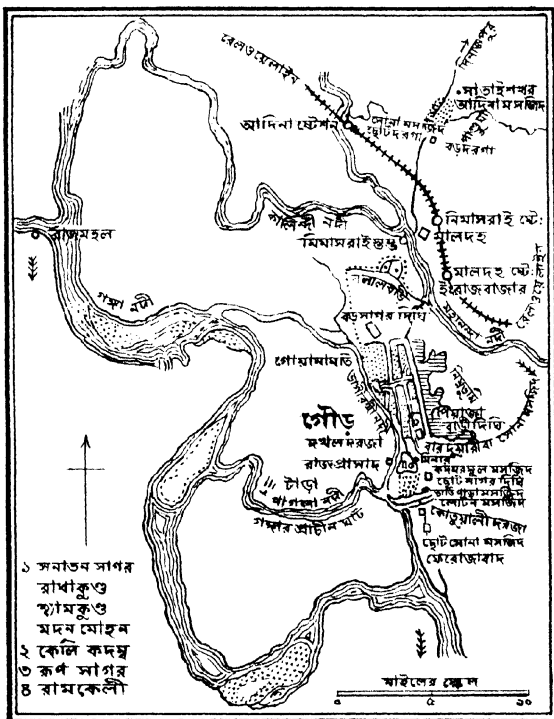
বেঙ্গল আর্ট স্টুডিও এণ্ড প্রিঃ লিঃ

গৌড় ও পাণ্ডুয়া
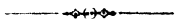
গৌড় নগরের বর্ত্তমান অবস্থা

বাঙ্গালার প্রাচীন সমৃদ্ধ রাজধানী গৌড়নগর এখন ধ্বংশাবশেষে পরিণত। ধ্বংশোন্মুখ নগরের ইষ্টক-স্তূপরাশি, খোদিত প্রস্তরখণ্ড, এবং ভগ্নঅট্টালিকার নির্ম্মাণকৌশল দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দেশ অতি প্রাচীন কালে শিল্পনৈপুণ্যে এবং স্থপতিবিদ্যায় কত উন্নত ছিল। কত শত শত বৎসর পূর্ব্বের রঙ্গীন ইষ্টকগুলি এখনও স্থানে স্থানে নূতনের মত রহিয়াছে। বর্ত্তমান গৌড়নগরের স্মৃতিসংরক্ষণার্থ ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর স্বয়ং গৌড়ে আসিয়া যাহাতে এই সমুদায় পৌরাণিক কীর্ত্তিগুলি কোন প্রকারে নষ্ট না হয় সেজন্য স্থানে স্থানে চৌকিদার পাহারার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া যান। তাঁহার আদেশক্রমে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে দুই একটী মসজিদের ভগ্নস্থান পুনঃ মেরামত করান হইয়াছিল, কিন্তু সেই পূর্ব্ব গাঁথনির সঙ্গে

এ নূতন গাঁথনি কোন অংশেই মিশিতে পারে নাই। এই সদনুষ্ঠানের জন্য গৌড়বাসী প্রকৃতিপুঞ্জ এখনও লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই সময় উক্ত গভর্ণরজেনারল বাহাদুর ঐ সমস্ত পুরাকীর্ত্তি সংরক্ষণে যত্নবান না হইলে এত দিনে উহার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিত কিনা সন্দেহ। প্রবাদ এইরূপ এবং কথাটীও একেবারে অসত্য নহে যে সমস্ত মালদহ জিলা, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমা এবং মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার ইষ্টক নির্ম্মিত বাটীগুলির অধিকাংশই এই গৌড়নগর হইতে সংগৃহীত ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত। বড় বড় মসজিদগুলির যে সমস্ত অংশের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চীনদেশীয় কারিকরগণের সাহায্যে পুনসংস্কার হইয়াছিল তাহা এখন শৈবালময় কদাকার রূপ ধারণ করিয়াছে কিন্তু সেই প্রাচীন সময়ের পুরাতন গাঁথনি এখনও স্থানে স্থানে নূতনের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

আমাদের দেশ কোন দিনই গরীব ছিলনা। এই গৌড় নগরে যে কত ধন দৌলত ছিল আজ পর্য্যন্তও তাহার ইয়ত্তা হয় নাই। লোকে এখনও সময় সময় সোনা, রূপা, টাকা, পয়সা মোহর এবং এমন কি সোণার থালা ঘটিবাটী পর্য্যন্তও কুড়াইয়া পাইয়া থাকে। এইরূপ

শ্রুত হওয়া যায় যে, গৌড়ের প্রভাবকালে বিশিষ্ট লোক-দিগের গৃহে যথেষ্ট সোনার বাসন ব্যবহৃত হইত এবং ঐ সমস্তই বিশিষ্টতার নিদর্শনরূপে আলোচিত এবং প্রশংসিত হইত।

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার সহর হইতে যে রাস্তা বরাবর কানসাট অভিমুখে গিয়াছে সেই রাস্তার চারি মাইল দূর হইতে বর্ত্তমান গৌড়নগরের সীমানা আরম্ভ; কিন্তু প্রকৃত গৌড়ের সীমানা তাহা নহে। প্রকৃত গৌড়ের সীমানা কালিন্দী নদীর তীরবর্ত্তী পিছলি গঙ্গারামপুর গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দক্ষিণে লম্বায় প্রায় ২২।২৪ মাইল এবং চওড়ায় প্রায় ৫।৬ মাইল হইবে। ক্রমে নগর দক্ষিণে সরিতে সরিতে একেবারে কমলাবাড়ী গ্রামের দক্ষিণাংশ হইতে বর্ত্তমান গৌড়ের সীমানা আরম্ভ হইয়াছে। নগর ক্রমে দক্ষিণে সরিবার কারণ যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় যে হয়ত নদীর গতি পরিবর্ত্তনের জন্য অথবা মুসলমানদিগের হস্ত হইতে নগর সুরক্ষণার্থ হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক নগর দক্ষিণে সরাণ হইয়াছিল। গঙ্গারামপুর এবং সোনাতলির মধ্যবর্ত্তী স্থানে চতুর্দ্দিকে জঙ্গলাবৃত যে দীঘি আছে তাহার নাম কাজল দীঘি। এই দীঘির সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রবাদ বাক্য

এইরূপ যে লোকে যাহা মানস করিয়া যাইত তাহাই ইহার পারে পাইত। ইহা বল্লালসেনের সময় খনিত হইয়াছিল। সোনাতলী গ্রামের পূর্ব্বভাগে বল্লালবাড়ী বা বাগবাড়ী নামক যে গ্রাম আছে সেই খানেই বল্লালসেনের বাড়ী ছিল এবং ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বভাগে টামনা দীঘি এবং টামনাদীঘিগড় এখনও বিদ্যমান। এই গড় এবং এই দীঘি বল্লালসেনের সময়ে নির্ম্মিত হইয়া ছিল। গৌড়ের প্রথম রাজধানী এই স্থানে ছিল বলিয়া অনেকের ধারণা এবং তাহা বাস্তবিক সম্ভবপর। তৎপর এইস্থান হইতে রাজধানী প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে সরান হয়। কারণ বর্ত্তমান চণ্ডিপুর গ্রামের যেখানে ৺ দ্বারবাসিনী (রণচণ্ডী) বিগ্রহমন্দির এখনও স্থাপিত আছেন, দ্বিতীয়বার রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার পর এই স্থানই যে নগরের উত্তরদিকের প্রবেশ-পথ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাদুল্লাপুর সন্নিকটস্থ বড় সাগরদীঘি বল্লাল সেনের সময় খনিত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় একমাইল এবং প্রস্থ প্রায় অর্দ্ধমাইল। এই দীঘিতে ছয়টী বাঁধাঘাট ছিল। ইহার পশ্চিম পারস্থিত বিশাল গড় বেষ্টিত বর্ত্তমান পার্ব্বতা, লুচিভাঙ্গা ও ধরমপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্যে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।

এই পার্ব্বতা গ্রামেই যে রাজা বল্লালসেনের আর একটী বাড়ী ছিল তাহার কতকটা নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে ফুলবাড়ীতে রাজা লক্ষ্মণসেনের বাড়ী ছিল কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন এখন পাওয়া যায় না। তবে ফুলবাড়ীর দক্ষিণে বর্ত্তমান হাবাসখানা গ্রামে পূর্ব্বে জেলখানা, বাজার এবং কৃতদাসদের বসতি ছিল এমত শুনা যায়। তৃতীয় বার রাজধানী স্থানান্তরিত করা সম্বন্ধে যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বলা যাইতে পারে লক্ষ্মণ সেন যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন তখন তিনিই ইহা স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। চাঁদনীর দক্ষিণে কতক অংশ পর্য্যন্ত লইয়া বর্ত্তমান গৌড়ের শেষ সীমানা। উত্তর দক্ষিণে ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ মাইল হইবে এবং চওড়ায় প্রায় দুই মাইল অপেক্ষা কিছু বেশী হইবে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফেরিয়া-ই-সুজা নামক একজন পর্ত্তুগিজ ঐতিহাসিক স্বচক্ষে গৌড়নগর পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, গৌড়ের লোক সংখ্যা বার লক্ষ"। * সমগ্র গৌড় নগরে মোট বাইশটী বাজার ছিল।

* ৬ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত গৌড়ের ইতিহাস ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৫।

মুসলমান রাজত্বকালে সাধারণ অপরাধে অনেককে কঠিন সাজা পাইতে হইত। সাধারণ অপরাধিগণকে সচরাচর এই বাইশটী বাজারে ঘুরান হইত এবং কোড়া অর্থাৎ বেতমারা হইত। দুইএক বাজারে কোড়া মারিতেই অপরাধি মরিয়া যাইত, তাহাতেও ছাড়া হইতনা, মৃত শরীরের উপরও কোড়া মারা হইত। * মুসলমানগণ বাঙ্গালা দেশ জয় করিবার পর ক্রমাগত ২৬ জন মুসলমান বাদশা গৌড়ে রাজত্ব করেন। মুসলমান রাজত্ব কালেও অনেকবার রাজধানীর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সুলতান করাণির সময়ে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজধানী গৌড় হইতে টাণ্ডায় যায়। মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত বর্ত্তমান জালুয়াবাধাল গ্রামের নাম টাণ্ডা ছিল। অনেকবার নদীতে এই গ্রাম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ইহার আর কোন পুরাতন চিহ্ন নাই। পরে মুনেম খাঁ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজধানী টাণ্ডা হইতে পুনরায় গৌড়ে লইয়া আসেন। তৎপর ১৫৮৯ খৃঃ রাজা মানসিংহ বাঙ্গলার

* শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত গৌড়ের ইতিহাস ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩৯।

শাসন কর্ত্তা হওয়ায় রাজধানী গৌড় হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইসলাম খাঁর রাজত্ব সময়ে ১৬০৮ খৃ রাজধানী ঢাকা নগরীতে যায়। তৎপরে সা মহম্মদসুজা রাজধানী পুনরায় রাজমহলে স্থাপিত করেন। আবার মিরজুম্লা রাজধানী পুনরায় ঢাকা নগরীতে স্থাপনা করেন। অবশেষে ১৭০৪খৃঃ মুরশিদ কুলিখাঁ কর্ত্তৃক রাজধানী ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে স্থাপিত হয়। ক্রমাগত রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য গৌড়ের সৌন্দর্য্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। তৎপর ১৮৮৫ সনের ভূমিকম্পে গৌড় নগরের সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। মুসলমান রাজত্ব সময়ে গৌড়ের নাম ফতেহাবাদ, হুসেনাবাদ ও নশরতাবাদ হইয়াছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন মুনেমখাঁ বাঙ্গলার শাসন কর্ত্তা ছিলেন সেই সময় গৌড়নগরে মহামারীর আবির্ভাব হয় এবং দৈনিক অসংখ্য লোক মারা যায় এমন কি দৈনিক হাজার লোকেরও অধিক মারা যাইত। তখন কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের মৃতদেহই নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইত। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে হিন্দু দেবদেবী মন্দিরগুলি ক্রমশ নষ্টকরা হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে মসজিদ নির্ম্মিত

হইয়াছিল। বর্ত্তমান ধ্বংশাবশেষ যাহা আছে তাহা সমস্তই মুসলমান বাদশাদের কীর্ত্তি। কোন কোন মসজিদের ভগ্ন প্রস্তর খণ্ডের অপর পার্শ্বে এখনও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। গৌড়ের ইস্টকগুলি দেখিতে অতি সুন্দর ও ছোট আকারের। অধিকাংশই সাদা, বেগুনে নীল ও সবুজ রং করা।

মুসলমান রাজত্বসময়েও গৌড়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গৌড়ে শিক্ষার বিস্তার, ধর্ম্মের আলোচনা, এবং স্বধর্ম্মের উন্নতিকল্পে ইহাঁরা গুজরাট প্রভৃতি স্থান হইতে বড় বড় মুসলমান পণ্ডিত আনয়ন করিয়াছিলেন। কোন এক সময়ে দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন ৬ মাসেরও অধিক কাল গৌড়ে বাস করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া গিয়াছিলেন।

গৌড় দেখিবার প্রশস্ত সময় শীতকাল। রীতিমত ভাবে সমগ্র গৌড় প্রদক্ষিণ করিতে হইলে ৪।৫ দিনের কমে হয় না, তবে লোকে সাধারণতঃ যে সব স্থান দেখিয়া থাকেন তাহাতে ২।১ দিনের মধ্যেই হইতে পাবে। জঙ্গলে বড় বড় ব্যাঘ্র, সর্পপ্রভৃতি হিংস্র জন্তু এখনও অনেক আছে এবং এখনকার প্রত্যেক দীঘিতেই সময় সময় যথেষ্ট সংখ্যক কুম্ভীর দেখিতে পওেয়া যায়।

এখন দেখিবার জিনিষের মধ্যে সোনারায়ের গড় পাতালচণ্ডী বা পাটলী দেবী, কালাপাহাড়ের গড় জাঁতা-ঘোরা পাথর বা শূলদণ্ড, পেঁয়াজবাড়ীদিঘী রামকেলী রূপসাগর, বারদুয়ারি, বা বড় সোনামসজিদ দখলদরজা, বা দুর্গের উত্তর দ্বার ফিরোজমিনার, কদমরসুল লুকোচুরি গেট বা দুর্গের পূর্ব্বদ্বার জহরাতলা, গৌড়েশ্বরী, টাকশাল দীঘি, ২২গজী প্রাচীর, খাজাঞ্চীখানা, চামকাটীমসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ লোটনমসজিদ, কোতোয়ালী দরজা বা দুর্গের দক্ষিণ দরজা, পিঠাওয়ালা মসজিদ, দরোশবাড়ী বা বিদ্যালয়, গুণমন্ত মসজিদ ছোট সোনা মসজিদ, নিয়ামত উল্লার বাড়ী ও মসজিদ, ঝনঝানিয়া মসজিদ, নিয়ামত উল্লার কবর ও পিলখানা, ছোট সাগর দীঘি, পাঁচখিলানো সাঁকো চাঁদ সদাগর ও ধনপত সদাগরের বাড়ী,বালুয়াদীঘি প্রভৃতি। প্লেগ মহামারীর আবির্ভাবের পর দীর্ঘ দিন গৌড় নগর একেবারে জনশূন্য অবস্থায় ছিল। অনেক লোক পলাইয়া গিয়া মালদহ জেলার নানা স্থানে বসতি করে। এখন লোকে এখানে স্থানে স্থানে জমি লইয়া বসতি এবং বাগান ইত্যাদি করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এখানে নাগর মণ্ডল, চাঁই মণ্ডল, বৈরাগী, ধানুক, কৈবর্ত্ত মুসলমান ও অল্পসংখ্যক পাহাড়িয়া জাতির বাস মাত্র।

স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঁচটী গৌড় ছিল। তন্মধ্যে বর্ত্তমান প্রতাপগড় জেলার কতকাংশ লইয়া একটী। তৎকালে প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানকেও গৌড় বলা হইত, মালব রাজ্যের কিয়দংশকেও গৌড় বলা হইত, বর্ত্তমান মধ্যভারতের সিন্ধবরা সিউনি জেলা প্রভৃতির কতকাংশকেও গৌড় বলা হইত এবং বাঙ্গালা দেশও গৌড় নামে অভিহিত হইত; তবে শেষোক্ত গৌড়ই অতিশয় প্রসিদ্ধ। পানিনি সূত্রেও পূর্ব্বদেশীয় নগরের উল্লেখে গৌড়ের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা :—

"আরিষ্ট গৌড় পূর্ব্বেচ"।

৬।২।১০০

সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থাদিতে যে গৌড়ের নাম লক্ষিত হয়, তাহা এই বঙ্গ দেশেরই প্রাচীন নাম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় ভাষা বলিলে এই দেশেরই ভাষাকে বুঝাইয়া থাকে। বস্তুত অন্যান্য স্থানের নাম গৌড় থাকিলেও সাধারণে প্রাচীন বঙ্গভূমিই গৌড় দেশ বলিয়া পরিচিত।

শূলদণ্ড

ইংরেজবাজার হইতে ৬ মাইলের পর ৭ মাইলের সন্নিকটে রাস্তার বাম পার্শ্বে দুইটী প্রস্তর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখন ইহার নিম্নতলের গাঁথনি দেখিলে বোধ হয় যে এই দুইটী স্তম্ভ একটী বৃহৎ অট্টালিকা সংলগ্ন ছিল। কিন্তু সে অট্টালিকার চিহ্ন বিশেষ কিছুই নাই। কেহ কেহ বলেন এই স্তম্ভ দুইটীর উপরে শূলদণ্ড ছিল। বাদশার আমলে গুরুতর অপরাধীগণকে এই শূলদণ্ডের উপর চড়াইয়া প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইত। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইহাকে জাঁতাঘোরা বা হাতিবাঁধা পাথর বলিয়া থাকে। ইহা লম্বায় প্রায় ৮।০ হাত এবং চওড়ায় প্রায় ৪।৫ হাত হইবে।

পেঁয়াজবাড়ী

ইংরেজবাজার সহর হইতে আটমাইল পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানটি বর্ত্তমান গৌড়ের প্রবেশ পথ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। এখানে একটী ডাক-বাঙ্গলা অবস্থিত এবং ইহার সংলগ্ন পূর্ব্বভাগে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত প্রকাণ্ড একটী দীঘি। দূরদেশ হইতে যে সমস্ত ভদ্র মহোদয়গণ গৌড় দর্শন করিতে আসিয়া

থাকেন তাঁহারা অধিকাংশই এই ডাকবাঙ্গালায় অবস্থান করেন। সেজন্য ইহার ভাড়া স্বতন্ত্র দিতে হয়। পেঁয়াজবাড়ী দীঘি রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে খনিত হইয়াছিল এমত লোকে বলিয়া থাকে। এখনও ইহার জল অতিপরিষ্কার। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার সেনিটারী কমিশনার বাহাদুর গৌড়ের কতকগুলি দীঘি ও পুষ্করিণীর জল পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন এই দীঘির জলই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কেহ কেহ বলেন যে মুসলমান রাজত্ব সময়ে এই দীঘির জল * বিষাক্ত উপাদানে মিশ্রিত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং কোন এক শ্রেণীর অপরাধিগণকে ইহার জল পান করাইয়া দণ্ডবিধান করা হইত। তখন এই জল পান করিলে পর ক্রমে ক্রমে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া আসামী অল্পদিন মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ইহার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোনে একটী সুড়ঙ্গ পথ ভাতিয়ার বিলের সহিত সংযুক্ত আছে এমত লোকে বলিয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এখানে একটী সেরিকালচারলস্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এই স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষ মহাশয়ের

* Mr. Gladwin's translation of Ain Akbari Vol Page 8.

উদ্যোগে এখানে একটা লাইব্রেরী, ডাক্তারখানা ও মুদিদোকান হইয়া সাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

রামকেলী ও রূপসনাতন

পৌয়াভবাড়ী ডাকবাঙ্গলা হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পশ্চিম দক্ষিণ কোণে এই রামকেলী গ্রাম অবস্থিত। রামকেলীর ভিতর প্রবেশ করিতেই ডাহিনদিকে ৺মদন-মোহন বিগ্রহের বাড়ী, তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটী বৃহৎ তমাল বৃক্ষ অবস্থিত। এই তমাল বৃক্ষের নিম্নতলে একটি শ্বেতপ্রস্তরে পদচিহ্ন আছে। লোকে এই পদচিহ্নকে চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন বলিয়া থাকে। এই ৺ মদনমোহনবিগ্রহ এখানে জীব গোস্বামী কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। এই জীব গোস্বামী রূপসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। এখানে প্রত্যহই যথানিয়মে পূজা হইয়া থাকে। এখানে রূপসাগর নামক একটি দীঘি আছে। এই দীঘির চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ২৫।৩০ ঘর বৈরাগী ও বৈষ্ণবীর বাস। এই দীঘি রূপসনাতনের সময়ে খনন করা হয় এই জন্য উহার নাম রূপসাগর হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠমাসে সংক্রান্তির দিন চৈতন্যদেব এখানে আসিয়া

এই তমালবৃক্ষমূলে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন এইজন্য এখানে প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে সংক্রান্তির দিন হইতে একটা বৃহৎ মেলা বসিয়া এক সপ্তাহকাল থাকে এবং এই উপলক্ষে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। নানা স্থান হইতে সওদাগরগণ নানা প্রকার বাসন—তামাপিত্তলের বাসন, পাথরের বাসন, খেলানা, কাপড়, ও কাটাকাপড় প্রভৃতির দোকান লইয়া এখানে আসেন এবং বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই মেলার সময় এইস্থানে বহুসংখ্যক নিম্ন শ্রেণীর বারবনিতার সমাগম হইত। স্থানীয় পত্রিকা "গৌড়দূত" এই কার্য্যের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন, ফলে তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার জে, এন, রায় মহোদয়ের অনুকম্পায় মেলার এইস্থানে বেশ্যা সমাগম রহিত হইয়া যায়।

সুলতান হুসেন সাহ যখন গৌড়ের বাদসা ছিলেন তাঁহার হিন্দু কর্ম্মচারিগণের প্রতি অত্যন্ত আস্থা ছিল এবং হিন্দু কর্ম্মচারী নিয়োগের দিকে খুব ঝোঁক ছিল। সনাতন প্রথমতঃ তাঁহার নিকট একটি কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাকে একটি সাধারণ কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর

পর রূপও চেষ্টা করিয়া বাদসা সরকারে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। উভয় ভ্রাতা অল্পদিন মধ্যে নিজ বিচক্ষণতা ও কর্ম্মকুশলতার ফলে বাদশাহের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং প্রধান অমাত্যের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া অতি সুচারুরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। ক্রমে রাজ্যমধ্যে ইহাদের অসীম ক্ষমতা বিস্তৃত হইয়া উঠিল। হুসেনসাহ ইহাদিগের কার্য্যে প্রীত হইয়া উভয় ভ্রাতাকে "সাকর মল্লিক" ও "দবিরখাস" উপাধি দিয়াছিলেন। এই রূপসনাতনের বাড়ী যশোহর জেলার অন্তর্গত প্রেমভাগ গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামে কুমার গোস্বামী নামক একজন পরম ধার্ম্মিক মহাপুরুষ বাস করিতেন। এই রূপসনাতন তাঁহারই পুত্র। কুমার গোস্বামীর প্রথম পুত্র সনাতন ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রূপ ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। চৈতন্যদেব ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন। তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে রামকেলীতে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনের পর অল্পক্ষণ মধ্যে সমগ্র গৌড় রাজধানীতে চৈতন্যধর্ম্মের প্রচার হইয়া গেল এবং যাবতীয়

হিন্দু পরিবার চৈতন্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া উঠিলেন। রূপ ও সনাতন উভয় ভ্রাতা চৈতন্য প্রেমে একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। অসীম রাজকীয় ক্ষমতা রাজকীয় সম্মান সমস্ত তুচ্ছ করিয়া উভয় ভ্রাতা চৈতন্য প্রেমে মজিয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করিলেন। বাদসা হুসেন সাহ ইহাদিগের এই সমস্ত কার্য্য কলাপ দেখিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হন এবং সনাতনকে বন্দী করিতে বাধ্য হন। সনাতন অতি চতুর ছিলেন। তিনি কারারক্ষিকে প্রচুর উৎকোচ দিয়া পুনরায় পলায়ন করেন এবং চৈতন্য দেবের সহগামী হন। উভয় ভ্রাতা মথুরাবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকাল তথায় বাস করেন এবং কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া এবং ধর্ম্মালোচনা করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে রূপ সনাতনের চরিত্র কথা অমর। রামকেলীতে রূপসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে রূপ সনাতনের বাসা বাড়ী ছিল। এখন তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। ইহারা উভয় ভ্রাতা কিছুদিন মাধাইপুর গ্রামের ইহাঁদের কোন আত্মীয় বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে কোন কার্য্য উপলক্ষে গৌড়ে আসিয়া বাদসাহের নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইয়াছিলেন। মাধাইপুরগ্রাম বর্ত্তমান

মালদহ রেলষ্টেশনের দুই মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রাম এক সময়ে খুব উন্নত এবং ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম নামে খ্যাত ছিল। রামকেলিতে শ্যামকুণ্ড, রাধা-কুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ড নামক চারিটি পুষ্করিণী আছে। কথিত আছে যে এই সমুদয় পুষ্করিণী নাকি জীবে গোস্বামীর সময় খনিত হইয়াছিল। রূপসাগরের দক্ষিণ দিকে একটি আখড়া আছে লোকে ইহাকে "ন্যাঙ্গটা আখড়া" বলে। এখানে একটি দালানের মধ্যে কতকগুলি বিগ্রহ আছেন এবং প্রতিদিন এই সমস্ত বিগ্রহের যথারীতিপূজা হইয়া থাকে এবং বৈষ্ণব-পর্ব্বোপলক্ষ্যে সময় সময় মহোৎসব হইয়া নানান শ্রেণীর লোক এখানে সমবেত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন ইত্যাদি করিয়া থাকে।

বড় সোনামসজিদ বা বারদুয়ারি *

রামকেলি মেলার দক্ষিণ সীমানার শেষভাগে উচ্চ ভূমির উপরে এই মসজিদটি ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে নশরত সাহার আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদটী সমচতুষ্কোণ আকারের। বোধ হয় কোন একসময় ইহার গম্বুজগুলি সোনার পাতে মোড়া ছিল অথবা নির্ম্মাণ কৌশল অতি সৌন্দর্য্যপূর্ণ ছিল। এমন কি সূর্য্যরশ্মি কিম্বা চন্দ্রের আলোক ইহার উপর পড়িলে এই মসজিদ ঠিক সোনারদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বোধহইত, সম্ভবতঃ লোকে ইহাকে এই জন্যই সোনামসজিদ বলিত। ইহার এখন কেবল বারান্দার ছাদ ও দেওয়াল বিদ্যমান আছে। ইহার উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্বে প্রবেশ করিবার জন্য তিনটী তোরণদ্বার আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে একটি সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ। বারান্দাটী উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৫০ ফুটেরও অধিক লম্বা হইবে। রামকেলি মেলার সময়ে ইহার বারান্দার দক্ষিণ পার্শ্বে থানা, ডাক্তারখানা প্রভৃতি বসিয়া থাকে এবং অসংখ্য বিভিন্নদেশীয় বৈরাগী

* Nasharat shaha's inscription No 17 published by Mr. Blockman in Journal Bengal Asiatic society Vol XLIII. Page 307.

ও বৈষ্ণবী ইহার সমগ্র প্রাঙ্গনে আশ্রয় লইয়া থাকে। লোকে সাধারণতঃ ইহাকে বারদুয়ারী বলে অর্থাৎ বারটী দুয়ার বিশিষ্ট মসজিদ কিন্তু ইহার সম্মুখে মাত্র এগারটি দুয়ার আছে। কেহ কেহ বলেন এই মসজিদ কোনও সময়ে আদালত গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত এবং স্ত্রীলোকেরা এই মসজিদে পরদা আড়ালে থাকিয়া বিচার কার্য্য করিয়াছেন। এই মসজিদটী দেখিতে খুব পুরাতন এবং ইহার বাহিরের যাবতীয় কাজই প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিকে একটী সুবৃহৎ দীঘি আছে। এই মসজিদটীর নিকটবর্ত্তী-স্থান সমূহে অনেক বড় বড় অট্টালিকা ছিল তাহার অনেক চিহ্ন এখনও দেখা যায় এবং ইহার কিঞ্চিৎ উত্তরভাগ হইতে যে একটী সম্পূর্ণ ইষ্টক নির্ম্মিত রাস্তা বাহির হইয়া ইহার উত্তর দরজার সম্মুখ দিয়া ক্রমে দখল দরজার নিকট গিয়াছিল তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে বাদশার আমলে এদেশে স্ত্রীলোক আসামীদের বিচার কার্য্য স্ত্রীলোক দ্বারাই করান হইত এবং সেই জন্য দুর্গের বাহিরে এই বাড়ীটা নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। তৎকালে স্ত্রীলোক

আসামীদের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল এবং তাহাতে পুরুষের কোনই সংস্রব থাকিত না। এই মসজিদের ছাদ এখন নাই; ইহার ছাদের উপরে ও নীচে ইঁট ও পাথর দ্বারা অতি সুন্দর ভাবে কারুকার্য্য করা হইয়াছিল। ১৮৮৫ সালের ভূমিকম্পে ইহার কতকগুলি ছাদ ও দেওয়াল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও ইহার যে সমস্ত অংশ এখনও আছে তাহা অতি পুরাতন হইলেও অত্যন্ত সুদৃঢ় ও মজবুত। বিশেষতঃ ইহার তোরণদ্বার তিনটির ভগ্নাবশেষ দেখিলে ইহার নির্ম্মাণ উপাদানের গুণ সহজেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

দখলদরজা

বারদুয়ারি বা বড় সোনামসজিদ হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোনে গৌড় দুর্গের দুইধারে প্রকাণ্ড উচ্চ গড়বন্দি এবং পরিখা বেষ্টিত উত্তরভাগে এই দরজা অবস্থিত। কেহ কেহ ইহাকে সিংহদ্বার বা সোনালী দরজাও বলিয়া থাকেন। ফলকথা এই দরজা যে দুর্গ প্রবেশের প্রধান পথ ছিল তাহাতে আর সন্দেহ

নাই। হুসেনসাহ যখন গৌড়ের বাদসা ছিলেন তখন এই দরজা প্রস্তুত হইয়াছিল। দরজা বন্ধ করিবার প্রবেশপথের দুই ধারে একটি প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড অথবা কাষ্ঠনির্ম্মিত ডাণ্ডা ছিল তাহার চিহ্ন এখনও আছে। এই দালানটী প্রায়—১১৪ ফিট হইবে। এই দরজাটি যে এক সময়ে খুব কারুকার্য্যবিশিষ্ট ছিল তাহা এখন দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। দুর্গমধ্যস্থ কর্ম্মচারীগণের এবং সাধারণ লোকের গমনাগমন জন্যই এই দরজা নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহার ভিতরকার রাস্তা প্রায় ১৪ ফিট লম্বা ছিল এবং দুইধারের দালান দুইটি ঠিক সমান মাপের। এই দালানগুলি প্রহরিগণের ব্যবহারের জন্য। এখানে সমগ্র প্রহরী মোতায়েন থাকিত। ইহার উত্তরভাগে একটি প্রকাণ্ড দীঘি ছিল, এখন তাহার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলাবৃত। ইহার দক্ষিণাংশ যাহা দুর্গের সীমানার মধ্যে ছিল, তাহার অধিকাংশ জমি আবাদ হইয়াছে এবং সেই সকল আবাদীজমি ভগ্ন ইঁট মিশ্রিত এবং স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ লালবর্ণযুক্ত। এই সমস্ত স্থানে বিশষভাবে তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই যে ইহা দুর্গের অভ্যন্তরস্থ জমি সংলগ্ন। এখানে একটি লৌহ শৃঙ্খল যুক্ত বৃহৎ ঘণ্টা ছিল। প্রহরিগণের বদলির জন্য

সেই ঘণ্টা বাজান হইত। এইখানে ঘণ্টা বাজিবার পর প্রহরিগণের বদলির কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে যাহার ব্যতিক্রমের প্রমাণ হইত তাহাকে বিশেষ সাজা পাইতে হইত।

ফিরোজ মিনার

এই * মিনারটি বার দুয়ারি বা বড় সোনামসজিদ হইতে প্রায় একমাইল দক্ষিণে এবং দুর্গের বাহিরে অবস্থিত। এই মিনারটি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ আছে। ইহার কোনটি যে প্রকৃত তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে ফিরোজশাহ যখন গৌড়ের বাদশা ছিলেন তখন তাঁহার আদেশক্রমে (পিরুসাহা) একজন মিস্ত্রী কর্ত্তৃক এই মিনারটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মিনারটি এখন প্রায় ৮৪ ফিট উচ্চ এবং প্রায় ২২ ফিট গোলাকার হইবে। ইহার উপর উঠিলে পর দুর্গের অভ্যন্তরস্থ যাবতায় জিনিষই দেখা

---

* J. B. A. S. Vol. XL ii. Part I Page 287 and Mr. Fergusson's History of India & Eastern Architecture Page 550.
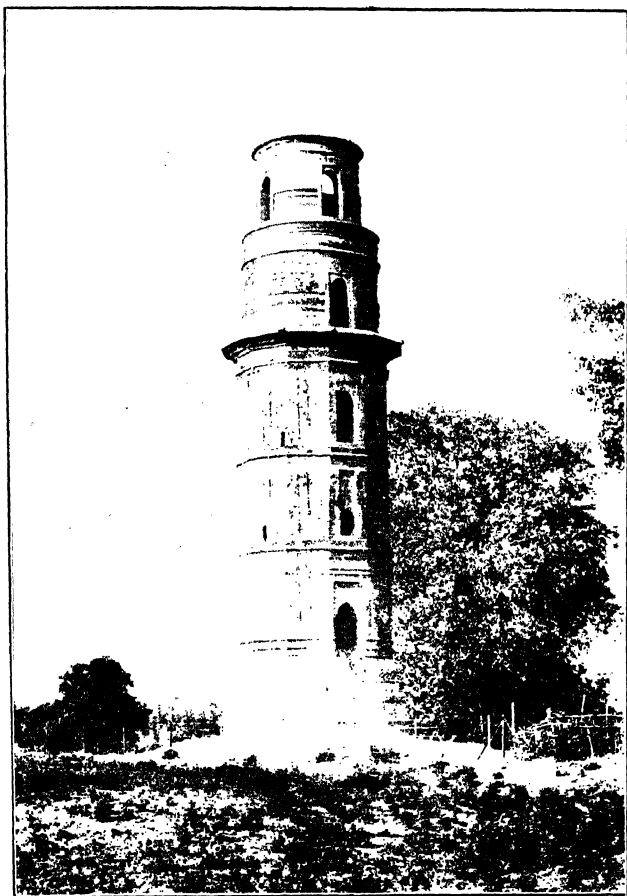
ফিরোজ মিনার

যায় এবং সমগ্র গৌড় নগরটি একখানি চিত্রপটের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এমন কি গঙ্গার পশ্চিম পারস্থিত রাজমহল, তিনপাহাড় প্রভৃতি স্থানও দেখা যায়। ইহার মধ্যস্থ সিঁড়িগুলি সমস্তই পাথর নির্ম্মিত। কেহ কেহ বলেন ইহা পূর্ব্বে নাকি আরও উচ্চ ছিল। ইহার অগ্রভাগ ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া যায়। তৎপর পুনরায় মেরামত করা হইলেও আর পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চ করা হয় নাই। লোকে ইহাকে "পীরে আসা" বা "চেরাগদানী" ও বলিয়া থাকে। চেরাগদানা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে নিম্নশ্রেণীর লোকের মনের সংস্কার এই যে বাদশাহের আমলে ইহার উপর আলো দেওয়া হইত। কিন্তু একথার কোনও ভিত্তি নাই। গৌড়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক মালদহ জেলার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ র্যাভেন্সা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই মিনারের উপর উঠিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে ইহার ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়াছিলেন। মিঃ র্যাভেন্সার ফটোগ্রাফ দেখিলে বোধ হয় যে এই মিনার বর্ত্তমান আকার হইতে অনেক উচ্চ ছিল এবং ইহার অগ্রভাগের ভগ্নঅংশও তাহাতে উঠিয়াছে। বাঙ্গলা দেশ ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়ার পর মিষ্টার হারউড সাহেব ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়নগর

প্রদক্ষিণ করিতে আইসেন এবং এই মিনারের উপর উঠিয়া সমগ্র গৌড় নগরের দৃশ্য দেখিয়াছিলেন এবং ইহার ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়াছিলেন।

মেজর ফ্যাঙ্কলীন একখানি ক্ষোদিত প্রস্তরের উপর দেখিতে পান যে একটি মিনার ১৪৮১ সালে ফিরোজ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে কিন্তু সেই ক্ষোদিত প্রস্তর খণ্ড এই স্থান হইতে চারি মাইল উত্তরে গুয়ামালতি নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল কাজেই এই মিনারটিই যে ফিরোজ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এ সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ এইরূপ যে পিরু শাহ কর্ত্তৃক এই মিনারটি নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে পর ফিরোজ শাহ দেখিতে যান। সেই সময় পিরুশাহ বলে যে আমি যদি ইহা অপেক্ষা আরও ভাল মসলা পাইতাম তাহা হইলে এই মিনারটি আরও ভাল করিতে পারিতাম। এই কথা শুনিয়া ফিরোজ শাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন যে তুমি কেন আমাকে ইহা পূর্ব্বে জানাও নাই? এই অপরাধে হতভাগ্য পিরুশাহর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। ফিরোজ শাহর আদেশক্রমে পিরুশাহ এই মিনারের উপর উঠিয়া লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

২৫ পৃঃ। লুকোচুরি গেট বা দুর্গের পূর্ব্বদরজা।
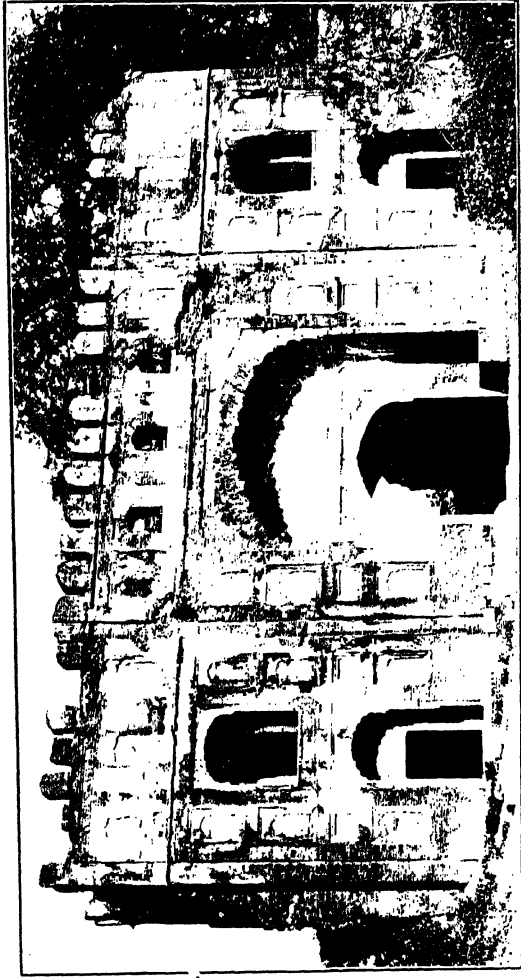
পিরুশাহ বাদসাহের দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া উক্ত বাদশাহের নিকট এরূপ প্রতিশ্রুতি লাভ করে যে তৎকালাবধি উক্ত মিনার তাহারই নামানুসারে চিহ্নিত থাকিবে। এবং তদবধি উহা পিরুশা মিনার বলিয়া আখ্যাযুক্ত হয়। পিরুশাহর মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহর আদেশক্রমে এই মিনারটি ভাঙ্গিয়া পুনরায় নূতন করিয়া নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়। তৎকালে মরগাঁও মাধাইপুর গ্রামে অনেক মিস্ত্রীর বসতি ছিল। রাজধানী হইতে দুইজন লোক আসিয়া মরগাঁ মাধাইপুর হইতে মিস্ত্রী লইয়া পুনরায় এই মিনারের কাজ আরম্ভ করায়।

---

* লুকোচুরি গেট বা দুর্গের পূর্ব্ব দরজা

দুর্গ মধ্যে এবং রাজপ্রসাদে প্রবেশপথের পূর্ব্বদিকে একটী প্রকাণ্ড দ্বিতল গৃহতলে এই দরজা অবস্থিত। এই দরজা সংলগ্ন উপর ও নিম্নতলে কতকগুলি কুঠরি

* Mr. Blockman's Journal, Bengal, Asiatic Society, Part. I page 292

আছে। নিম্নতলে প্রহরীগণ থাকিত এবং ইহার উপর নহবতখানা ছিল। হোসেন সাহার একটী প্রস্তর লিপিতে লিখিত আছে যে ৯২৮ হিজিরায় এই দরজা হোসেন শাহার আদেশক্রমে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দরজা দ্বারা বাদসা স্বয়ং বা তদীয় পরিবারভুক্ত লোক ভিন্ন অন্য লোকের গমনাগমন নিষেধ ছিল। এই দরজা সংরক্ষণের জন্য সর্ব্বদাই সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত থাকিত। এই দরজাটী ইঁট পাথর ও প্লাষ্টার দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা এত সুদৃঢ় ভাবে নির্ম্মিত যে শত্রুপক্ষীয় লোকে কামান ছুঁড়িলেও ইহার সহসা কোন নষ্ট হইবার উপায় নাই। আজি বহু শতাব্দীর পর এখনও ইহা অত্যন্ত মজবুত আছে। গৌড় দর্শকগণ ইহার উপরের সমস্ত কুঠরিতে বেড়াইয়া থাকেন। যদিও এখন ইহার ভিতরের এবং বাহিরের কতকগুলি আস্তর খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে তথাপি এই দরজাটী যে এক সময়ে গৌড়ের মধ্যে অতীব সৌন্দর্য্যপূর্ণ ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। দুর্গের পূর্ব্ব দরজাই ইহার প্রকৃত নিদর্শন কিন্তু দ্বিতল এবং নিম্নতলস্থ কুঠরিগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত যে দেখিলে মনে হয় বাস্তবিকই কখন ইহা লুকোচুরি খেলিবার স্থান ছিল এই জন্যই বোধ হয় নিম্নশ্রেণীর

কদম রসুল এবং ফতেখাঁর সমাধি গৃহ।
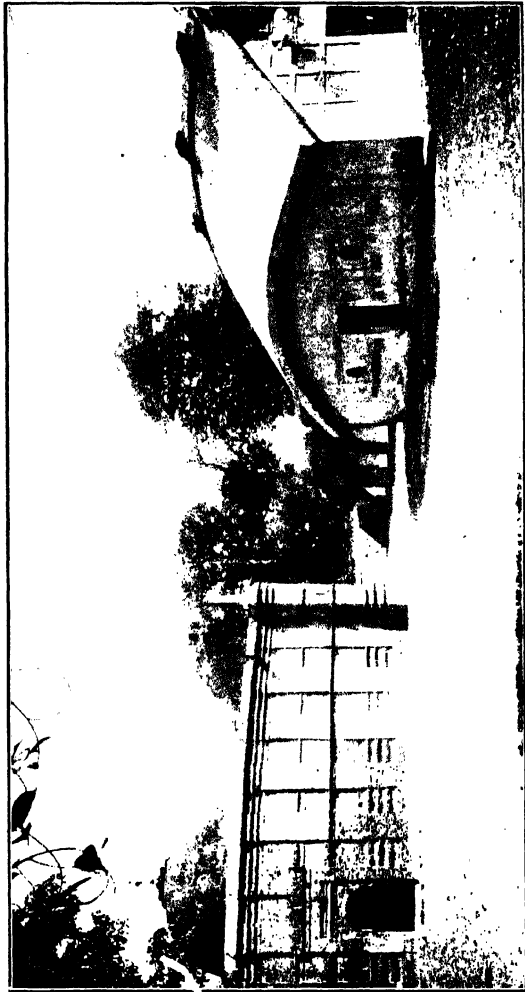
লোকগণ ইহার লুকোচুরি নাম দিয়াছে এবং এখনও তাহাদের মনের সংস্কার এই যে বাদসা বেগমগণ সহ এখানে লুকোচুরী খেলিতেন। এই স্থানের কুঠরী-গুলির নির্ম্মাণ কুশলতা পাশ্চাত্য ইঞ্জিনিয়ারবর্গেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। কুঠরীগুলির ছাদ ঐ সময়ে কি বিশেষ উপায়ে যে সমতল ভাবে জমাট করা হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

কদম রসূল

শাহজালাল কিম্বা অন্য কোন সাধু পুরুষ মহম্মদের পদচিহ্নিত একখানি প্রস্তর আরবদেশ হইতে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। এই পাথরখানি পূর্ব্বে পাণ্ডুয়া নগরে শাহ জালালউদ্দিন তাব্রিজির গৃহে ছিল। সুলতান হোসেনশাহ ইহা গৌড়ে আনয়ন করেন। একটা বাক্সের উপর উক্ত পদচিহ্ন মণি-মাণিক্য-খচিত চাদর দ্বারা আবৃত করিয়া পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে আনা হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কদম রসূল উঠাইয়া লইয়া মুরশিদাবাদে স্থাপিত করেন; তৎপর মির্জ্জাফর তথা হইতে গৌড়ে পুনঃ স্থাপন করেন।

সুলতান নসরত শাহ কর্ত্তৃক ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই মসজিদটী নির্ম্মিত হয়। এই মস্জিদটী দুর্গের মধ্যে এবং পূর্ব্ব দরজার অতি সন্নিকটে অবস্থিত। এই মস্‌জিদে মহম্মদের উক্ত পদচিহ্নাঙ্কিত প্রস্তরখানি প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেকেই বলেন যে গৌড়ের মধ্যে এইটাই শেষ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পশ্চিম দিকে বৃহৎ পুকুর আছে তাহার নাম জালালিপুকুর। এই পুকুর জালালউদ্দিন খিলিজির সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত জোড় বাঙ্গালা সদৃশ গৃহ আছে। এই গৃহটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। কেহ কেহ বলেন এই গৃহটি রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহা একটি হিন্দু বিগ্রহ মন্দির ছিল। এখন ইহাতে ফতেখাঁর কবর আছে। এই দালানের মধ্যপ্রকোষ্ঠের দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট ২ ইঞ্চি। ইহার দেওয়াল গুলি পাঁচফুট সরু। ইহার সন্নিকটে কতকগুলি ভাঙ্গা দালান ও কবর আছে। অনেকে অনুমান করেন এই সমস্ত কবর হোসেন সাহা, নশরত সাহা এবং তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণের। ফতেখাঁ এবং তাঁহার পিতা দিলার খাঁর গৌড়ে আসিবার কারণ সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাহাতে বোধ হয় যে

দিল্লীর সম্রাট আরঙ্গজেব নিয়ামত উল্লাকে বধ করিবার জন্য ইঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। কারণ তাঁহার ধারণা ছিল যে নিয়ামতউল্লা সূজাকে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন। ফতেখাঁ গৌড়ে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই রক্ত বমন করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা দিলার খাঁ আরঙ্গজেবের আদেশ ক্রমে পুনরায় দিল্লীতে ফিরিয়া যান। তাঁহার পিতার ধারণা হয় যে নিয়ামত উল্লার ন্যায় একজন সাধু মহাপুরুষকে হত্যা করিতে আসাতেই ফতেখাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই খানে প্রতি বৎসর পৌষমাসে ৫।৬ দিনের জন্য ছোট একটা মেলা লাগিয়া থাকে তাহার নাম রসুলের মেলা।

চিকা মসজিদ

কদমরসুলের প্রায় তিনরশি দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এই মসজিদটী ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত একটীমাত্র সুবৃহৎ গম্বুজবিশিষ্ট

পুরাতন মসজিদ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই বাড়াটা জেলখানা, আদালত গৃহ অথবা রাজকীয় বন্দিগণের জন্য ব্যবহৃত হইত। ইহার বারান্দার তিন দিকে যে প্রহরীর বন্দোবস্ত ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহার দেওয়ালগুলি অত্যন্ত পুরু এবং এই বাড়াটা অত্যন্ত মজবুত। এই মসজিদটার সহিত পাণ্ডুয়ার এক লাখী মসজিদের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার অতি সন্নিকটে এবং দুর্গের পূর্ব্বদরজায় কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটা প্রবেশপথ আছে তাহার নাম "গুমতি"। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কয়েদী গণের যাতায়াতের জন্যই এই রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নাম চিকা মসজিদ হইবার তাৎপর্য্য এই যে ইহার মধ্যে এখন অসংখ্য চামচিকা ও বাদুড়ের বাস।

বাইশগজী প্রাচীর

এই প্রাচীরটী রক্তবর্ণ ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। উত্তর দক্ষিণে অনেকদূর পর্য্যন্ত লম্বা ছিল। এখন

ইহার ভগ্নাবশেষ দুর্গের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই প্রাচীরের উচ্চতা এখন আন্দাজ ৪০ ফুটেরও অধিক হইবে এবং প্রস্থ প্রায় ২০ ফুট হইবে। ইহা বারবক সাহার সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার উপরি ভাগ ক্ষোদিত ইষ্টক দ্বারা শোভিত ছিল। কোন এক সময়ে এই প্রাচীর দুর্গের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ মধ্যস্থ প্রাসাদটী তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার প্রথম অংশ দরবার গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত, দ্বিতীয় অংশ বাদশাদের নিজ ব্যবহারের জন্য ছিল এবং তৃতীয় অংশ অন্দর মহাল ছিল। এই সমস্ত দালান গুলি যে খুব বড় ছিল তাহা নহে এবং ইহার এক অংশ হইতে অন্য অংশে দালানের ভিতর দিয়া কোন দরজা বা পথ ছিলনা। প্রত্যেক অংশের ব্যবহারের জন্য একএকটী স্বতন্ত্র পুষ্করিণী ছিল। এই প্রাচীর যখন অটুট্ অবস্থায় ছিল তখন ইহার উচ্চতা আরও অনেক বেশী ছিল। এখন ইহার স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার উপরে কোথায়ও বা বড় বড় বৃক্ষ এবং কোথায়ও বা একেবারে জঙ্গল। এই প্রাচীরের ইঁটের গাঁথনিগুলি এমনই সুদৃঢ় যে

দেখিলে মনে হয় না যে ইহার কখন ধ্বংশ হইতে পারে। স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর লোকের এই প্রাচীর সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ধারণা এখনও আছে। তাহারা বলিয়া থাকে যে গৌড়ের বাদসা ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইবার জন্যই এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

খাজাঞ্চি খানা

দুর্গ মধ্যস্থ রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন এবং কদমরসূল হইতে প্রায় ২০।২৫ রশি উত্তর পশ্চিমে জেনানা মহাল সন্নিকটে এই খাজাঞ্চি খানা স্থাপিত। ইহার নিকটে একটী দীঘি আছে তাহার নাম টাকশাল দীঘি। এই টাকশাল দীঘির নাম শুনিয়া অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে এখানে টাকশাল ছিল কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রকৃত টাকশাল চাঁদনীর দক্ষিণে ধোবড়া গ্রামের মধ্যে ছিল এবং সেই টাকশালে নির্ম্মিত মুদ্রাও সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় এখানে আদায়ী টাকা মজুত রাখা হইত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করা হইত এবং

সেই জন্য ইহার নাম খাজাঞ্চিখানা হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানের চিহ্ন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ইহার চারি পাঁচ রশি দূরে উত্তর পূর্ব্ব কোনে বাঙ্গলাকোট নামক স্থানে হুসেনসাহার এবং নশরথ সাহার কবর ছিল এমত লোকে বলিয়া থাকে কিন্তু তাহার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না।

পিঠাওয়ালীর মসজিদ

এই মস্‌জিদটী কানসাট রাস্তার বাম পার্শ্বে কোতোয়ালী দরজা সন্নিকটে অবস্থিত। অতি প্রাচীনকালে এইস্থানে একটি বাজার ছিল এবং সেই বাজারে একটি স্ত্রীলোক পিঠা বিক্রয় করিত। এই মস্‌জিদটী সেই পিঠাওয়ালী কর্ত্তৃক স্থাপিত এমত জনশ্রুতি। সামান্য কিঞ্চিৎ ভগ্ন-ইষ্টকস্তূপমাত্র এখন আছে। এই মসজিদ সম্বন্ধে আর কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

চামকাটী মসজিদ

এই মসজিদ্‌টী ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইউসুফ সাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুলতান ইউসুফ সাহা যখন গৌড়ের বাদসা ছিলেন তখন এক ফকির সময় সময় তাঁহার নিকট নানা প্রকার ওস্তাদী দেখাইত এবং

কখন কখন নিজের অঙ্গের চর্ম্ম কাটিয়া বাহাদুরি দেখাইত। বাদশা তাহার থাকিবার জন্য এই মসজিদটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখন ইহার সামান্য কিঞ্চিৎ মাত্র নিদর্শন অবশিষ্ট আছে।

* তাঁতি পাড়া মসজিদ

যেখানে এই মসজিদটী স্থাপিত বাদশার আমলে সেই স্থানটীর নাম মহাজন টোলা ছিল। ইহা একটি প্রকাণ্ড চতুষ্কোন আকারের মসজিদ। ইংরেজবাজার হইতে প্রায় ১১ মাইল দূরে কানসাট রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে এই মসজিদটী অবস্থিত। এই মসজিদে প্রবেশ পথের বাম ধারে দুইটী কষ্টিপাথরের কবর দেখা যায়। তাহার একটী উমর কাজির ও অপরটি জুলকরয়ণের। এই মসজিদটী দেখিতে অতি সুন্দর এবং একেবারে নূতনের মত! মসজিদটী গৌড়ীয়ইষ্টকনির্ম্মিত। মসজিদের বায়ু কোণের ইষ্টকগুলি নানা আকারে কাটিয়া বসান হইয়াছে। একটু অনুধাবনার সহিত লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সময় ঐ সমস্ত ইষ্টক

* Mr. Ravenshaw's Gour and its Ruins and cnsiriptions Page 30.

কাটা হইয়াছিল তখন উহার গাত্রে যে সামান্য সামান্য রেখা টানা হইয়াছিল অদ্যাপি সে সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই ঘটনা দ্বারা ইষ্টকগুলির কাঠিন্য এবং বিশেষত্ব সূচিত হইতে পারে।

লোটন মসজিদ

এই মসজিদটী যে কাহার সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা কিছুই নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায়না। তবে এই মাত্র জানা গিয়াছে যে গৌড়ের কোন বাদশা কর্ত্তৃক নটু নাম্নী একজন নর্ত্তকী আনীত হইয়াছিল এবং তাহাকে গৌড়ে স্থায়ী ভাবে রাখিবার জন্য কিছু জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল এই নর্ত্তকীর অপর নাম মিরাবাই ছিল। * এই নটু বা মিরাবাই কর্ত্তৃক এই মসজিদটী স্থাপিত হওয়ার জন্য ইহার নাম লোটন মসজিদ হইয়াছে। এই মিরাবাইকে যে জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল তাহার নাম মিরাতালুক। এই মিরাতালুক এখন বালুয়া দীঘির তিন মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত এবং এখানে কতকগুলি মুসলমান, সাঁওতাল ও ধাঙ্গর জাতি বাস করিতেছে। *

---

* শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত গৌড়ের ইতিহাস ২য় খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা।

গুণমন্ত মসজিদ

এই মসজিদটী যে কোন সময়ে এবং কাহা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। ভাগীরথী তীরস্থিত মহদীপুরগ্রামের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে এই মসজিদটী ভগ্নদশায় পড়িয়া আছে। এই মসজিদটী যে খুব উচ্চভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন যে এই মসজিদ হইতে অনেক ইষ্টক এবং পাথর মুর্শিদাবাদে নবাব বাড়ীতে লওয়া হইয়াছে। স্থানীয় মুসলমানগণ পর্ব্বোপলক্ষে সময় সময় এখানে আসিয়া নমাজ পড়িয়া থাকেন। ইহার চতুর্দ্দিকে এত জঙ্গল যে এই স্থান দিয়া দিবসে একা চলিতে ভয় হয়। ইহার দুই রশি আন্দাজ উত্তরে আর একটী ভগ্ন মসজিদের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকে ইহাকে ছোট গুণমন্ত মসজিদ বলিয়া থাকে।

পাঁচখিলানো সাঁকো

রাজা লক্ষ্মণসেন গৌড়ের ভিতর গঙ্গাজল আনিবার জন্য ভাগীরথী হইতে পূর্ব্বদিকে বহু বিস্তৃত এক খাল খনন করিয়াছিলেন। সেই খাল দ্বারা গৌড়ের ভিতর গঙ্গাজল প্রবাহিত হইত। সেই খালের উপর তিনি দুই স্থানে দুইটী সাঁকো নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহারপর

মুসলমান রাজত্বসময়ে ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে মামুদশাহ এই দুইটী সাঁকো ভাঙ্গিয়া পুনরায় নূতন ভাবে গঠিত করেন। পাঁচটী খিলানোর উপর এই সাঁকো নিৰ্ম্মিত। ইহার একটী সাঁকো কানসাট রাস্তার উপরে কোতোয়ালী দরজার অৰ্দ্ধ মাইল উত্তরে ও অপরটী গুণমন্ত মসজিদ হইতে উমরপুর বাজারে যাইতে রাস্তার মধ্যপথে অবস্থিত।

* কোতোয়ালী দরজা।

এই দরজাটী লোটন মসজিদ হইতে একমাইল দক্ষিণে এবং দুর্গের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ইহার দুইধারে গড়বন্দী এই দরজাটি পাথর দ্বারা নিৰ্ম্মিত ছিল। যেরূপ কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে কামান ছাড়িবার জন্য পরিখার পার্শ্বেই উচ্চভূমিতে কতকগুলি স্বতন্ত্র স্থান আছে, ইহার পূৰ্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে সেইরূপ কতকগুলি স্থান এখনও আছে। এই দরজাটী এমনই সুদৃঢ় ভাবে নিৰ্ম্মিত যে সহসা শত্রুপক্ষ কোন ক্রমেই নগরে প্রবেশ করিতে প্রয়াসী হইতনা। এই দরজাটী ত্রিশ ফিটেরও অধিক উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। এইখানে

---

* Mr. Blockman's Journal Bengal Asiatic Society Vol. XLIV Part I. Page 289.

নাকি বাদশার আমলে পুলিশ ফৌজ থাকিত এমত লোকে বলিয়া থাকে। ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ কর্ত্তৃক এই দরজাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাকেই দুর্গের দক্ষিণ দুয়ার বলিয়া থাকে। ইহার উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটি প্রকাণ্ড দীঘি। ইহার নাম ছোট সাগরদীঘি। এই দীঘিটা রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় খনিত হইয়াছিল। ইহার জল এখনও অতি পরিষ্কার। উত্তর প্রান্তে গৌড়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী চাঁদসদাগরের বাড়ী ছিল।

এই কোতোয়ালী দরজার কিছু দক্ষিণে রাস্তার বামধারে আর একটি দীঘি আছে তাহার নাম বালুয়া দীঘি। বালুয়া দীঘি নাম হইবার তাৎপর্য্য এই যে ইহার নিম্নতল বালুকাময়।

ঘড়িখানা

এই ঘড়িখানার বাড়ীটা মুসলমান রাজত্বকালে কোন বাদশা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা দখল দরজা বা সেলামী গেটের কিছু দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। এখন ইহার প্রায় অংশই ইষ্টক স্তূপাকারে পরিণত হইয়াছে। এইখানে ঘণ্টা বাজান হইত। এই ঘণ্টার শব্দ নাকি অনেক দূর হইতে শোনা যাইত। কেহ কেহ বলেন যে এই ঘণ্টা এখন মুর্শিদাবাদ নবাব বাড়ীতে আছে।

ছোট সোনা মসজিদ বা সোলতানি মসজিদ।

রাজবিবি মসজিদ

এই মসজিদটী যে কোন সময়ে এবং কাহা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। বালুয়া ও খানিয়া দীঘির মধ্যবর্ত্তী স্থানে এবং কোতোয়ালী দরজার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে এই মস্‌জিদটী অবস্থিত। ইহাতে এখন একটি মাত্র গম্বুজ আছে। ইহার সন্নিকটে আর একটি ভগ্ন মসজিদের চিহ্ন দেখা যায় তাহাকে ধনীচক মস্‌জিদ বলে।

ঝনঝনিয়া মসজিদ

মুসলমান রাজত্বের শেষ ভাগে প্লেগ মহামারিতে মহানগরী আক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে জানজাহান মিঞা নামক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই মসজিদটী নির্ম্মিত হয় এই জন্য ইহার নাম ঝনঝনিয়া হইয়াছে। সাদুল্লাপুর সন্নিকটে বড় সাগরদীঘির উত্তর প্রান্তে অবস্থিত।

ছোট্ট সোনা মসজিদ বা
খোজাকি মসজিদ

হোসেন শাহ যখন গৌড়ের বাদশা ছিলেন সেই সময় ওয়ালি মহম্মদ কর্ত্তৃক এই প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত

মসজিদটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদে পাথরের উপরে এমনই সুন্দরভাবে কারুকার্য্য করা হইয়াছিল তাহা আজিও অতি স্পষ্টভাবে রহিয়াছে। ইহার গম্বুজগুলি সোনার পাত দ্বারা মোড়ান ছিল এই জন্যই ইহার নাম সোনা মসজিদ হইয়াছে। এই মসজিদটী ইংরেজবাজার হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে এবং ফিরোজপুর ও চাঁদনি গ্রামের পূর্ব্বে কানসাট রাস্তার বামপার্শ্বে অবস্থিত। ইহার অতি সন্নিকটে বর্ত্তমান ধোবড়া নামক গ্রামে টাকশাল * ছিল। সেই টাকশাল সন্নিকটস্থ দীঘিটি এখনও টাকশাল দীঘি নামে অভিহিত। এই টাকশালে নির্ম্মিত স্বর্ণ রৌপ্য এবং তাম্রমুদ্রা অনেক দেখা গিয়াছে এবং এখনও মালদহ জেলার অনেক গ্রামে ইহা আছে। বর্ত্তমান ফিরোজপুর, মিলিক, চাঁদনি ও ধোবড়া প্রভৃতি গ্রাম লইয়া পূর্ব্বে ফিরোজপুর ছিল। এই সমস্ত গ্রামই গৌড় নগরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এই মসজিদের প্রায় অর্দ্ধমাইল উত্তর পশ্চিম ভাগে ফিরোজপুর গ্রামে বারটি দরজা বিশিষ্ট একটি দালান আছে তাহাকে লোকে নিয়ামতউল্লার বারদুয়ারি বলে।

---

* Thomas' Initial coinage of Bengal, p. 85.

ইহার সম্মুখে চারিটি প্রস্তর ফলকে কতকগুলি কোরাণের বচন লিখিত আছে। কেহ কেহ ইহাকে তহখানা বা তবখানা বা তিন চকের বাড়ী বলিয়া থাকে। ইহার সন্নিকটেই নিয়ামত উল্লার কবর আছে। ফিরোজপুর গ্রামের দক্ষিণভাগে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিবস একটি মেলা বসিয়া থাকে। তাহাকে গুজরাটি পীরের মেলা বলে। মেলা একদিন মাত্র থাকে।

দরশবাড়ী মসজিদ এবং বিদ্যালয়

মুসলমান রাজত্বকালে গৌড়নগরে পারস্যভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব না থাকিলেও শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধা ছিলনা। প্রজাবর্গের মধ্যে বড় বড় মৌলবীগণ গ্রামে গ্রামে কোরাণপাঠ ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং সকলেই যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে এজন্য সকলকেই ঘরে ঘরে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে বলিতেন। বলা বাহুল্য যে তখন এদেশে উর্দ্দু ও পারস্য ভাষারই সমধিক প্রচলন ছিল। তখন যে সমুদয় বিদ্যালয় ছিল তাহাতে উচ্চশিক্ষার সেরূপ ব্যবস্থা ছিলনা। মহম্মদ ইউশফ্‌ সাহা যখন গৌড়ের বাদসা ছিলেন তখন তাঁহার উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য

অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চরিত্রগঠন ও ধর্ম্মালোচনার বিশেষ প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার আদেশ ক্রমে ১৫০২ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা গড়মহলা নামক গ্রামের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে একটী উচ্চভূমির উপর নির্ম্মিত হয়। এখানে প্রত্যেক জুম্মা দিবসে শিক্ষক ও ছাত্র সমবেত হইয়া নমাজ পাঠ করিতেন। এখন ইহার ভগ্নাবশেষ মাত্রই আছে।

কালাপাহাড়ের গড়

বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার মান্দাথানার অন্তর্গত বীরজাউন গ্রামে কালাচাঁদ রায়ের বাড়ী ছিল। তাঁহার পিতা নয়ানচাঁদ রায় গৌড়ের বাদশা সরকারে চাকুরি করিতেন। কালাচাঁদ দেখিতে অতি সুন্দর ও বলিষ্ঠ ছিলেন। এই কালাচাঁদের অপর নাম ছিল কালা পাহাড়। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং লেখাপড়ায় বেশ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ দুই বিবাহ করেন। সুলেমান কররাণী যখন গৌড়ের বাদশা ছিলেন সেই সময় ইনি তাঁহার নিকট কর্ম্ম

প্রার্থী হন এবং তিনিও তাঁহাকে ফৌজদারী বিভাগে কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইনি অতি বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন। সুলেমানের কন্যা ইহাঁররূপে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বাদশাহের অনুরোধে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে হইল এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে হইল। এইজন্য হিন্দুসমাজ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইল কিন্তু কালাপাহাড় যদি তখন বাদসাহের কন্যাকে বিবাহ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেন তাহাহইলে হয়তঃ তাঁহার প্রাণদণ্ড হইত। ক্রমে তিনি ঘোর হিন্দু বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন এবং হিন্দুদেবদেবী সমস্ত ধ্বংশ করিতে লাগিলেন। উড়িষ্যা জয় করিয়া প্রথমতঃ জগন্নাথ দেবের মন্দির ধ্বংশ করেন এবং ক্রমে অধিকাংশ হিন্দু তীর্থ স্থানে এমনকি ৺কাশীধামে পর্য্যন্ত যথেষ্ট হিন্দু বিগ্রহ নষ্ট করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি কামরূপ আক্রমণ করিয়া সে প্রদেশেরও যথেষ্ট হিন্দু দেবদেবী নষ্ট করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি রোটাস দুর্গ আক্রমণ করিতে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই কালাপাহাড় গৌড়ে অবস্থান কালে গুয়ামালতির নিকট তাঁহার

বাসাবাড়ী ছিল। গুয়ামালতির গড়কে সেই জন্য কালাপাহাড়ের গড় বলে।

সোনারায়ের গড়

কাঞ্চনটারের দক্ষিণ হইতে যে গড় কাণসাট রাস্তার বামদিক দিয়া কোতোয়ালী দরজার নিকট মিশিয়াছে তাহাকে সোণারায়ের গড় বলে। এই গড ডাকাতের আড্ডা ছিল। এই গড সংলগ্ন ভাতিয়ার বিল ও গুলদহের বিলে নৌকা যাত্রীগণের প্রতি ডাকাইতি হইত। সোনারায়ের গড় যে কেন ইহার নাম হইল তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয় সোণারায় নামক পূর্ব্বে গৌড় রাজসরকারে কোন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং এই গড় সন্নিকটে তাঁহার বাসাবাড়ী ছিল সেই জন্যই লোকে ইহাকে সোনারায়ের গড় বলিয়া থাকে।

হিন্দু বিগ্রহ ও দেবদেবীর মন্দির

রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে গৌড়ে হিন্দু বিগ্রহ ও দেবদেবীমন্দির অনেক ছিল। মুসলমান

রাজত্বের প্রারম্ভে এই সমস্ত হিন্দু বিগ্রহ অনেক ধ্বংস হইয়া গেলেও বর্ত্তমানে ৺ গৌড়েশ্বরী, পাতাল চণ্ডি বা পাটলী দেবী, এবং জহরাতলা কালিমাতার বাড়ী প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত বিগ্রহ মন্দিরে এখনও হিন্দুগণকর্ত্তৃক যথা রীতি পূজা হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকালে গৌড়েশ্বরী বিগ্রহ মন্দির কমলাবাড়ী গ্রামের মধ্যে কোনও স্থানে স্থাপিত ছিল; তাহার পর কোনও কারণে রামকেলির দক্ষিণ ভাগে এবং গৌড়-দুর্গের প্রাচীরের উত্তর পশ্চিম সীমানায় স্থাপন করা হইয়াছে। সময় সময় এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাবেশ হইয়া থাকে।

পাতালচণ্ডি বা পাটলীদেবী। গুয়ামালতির দক্ষিণ ভাগে বাহাদুরপুর গ্রামের সন্নিকটে একটা ইন্দারার মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত এই বিগ্রহটি স্থাপিত। ইহার পশ্চিমভাগে একটী বৃহৎ জলাশয় (বিল)। বার মাসই এইখানে অগাধ জল থাকে। পূর্ব্বে এই স্থান দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত এবং এখানে একটী প্রকাণ্ড বন্দর ছিল। গৌড়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ধনপত সদাগর, চাঁদ সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর প্রভৃতির বড় বড় জাহাজ এই ঘাট হইতে মালাক্কা, সুমাত্রাও যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিত।

জহরাতলা কালীমাতা। সোনারায়ের গড় হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান গোবিন্দপুর গ্রামের অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে এই বিগ্রহ মন্দির স্থাপিত। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে এখানে চারিপাঁচ দিনের জন্য একটী মেলা বসিয়া থাকে এবং মহা সমারোহের সহিত পূজা হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক শনি ও মঙ্গল বারে এখানে যথারীতি পূজা হইয়া থাকে। এই স্থান ইংরেজ বাজার হইতে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানের বিশেষত্ব এই যে, এই মন্দিরের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর ভক্তগণই পূজা দিয়া থাকেন।

পুরাতন মালদহের প্রাচীন কীর্ত্তি

ইংরেজ বাজার সহর হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে কালিন্দী ও মহানন্দা নদীর সঙ্গমস্থলে এই সহরটী অবস্থিত। নদীর উপর হইতে এই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দালানকোঠা-পূর্ণ সহরটীর দৃশ্য বড়ই মনোরম। ইহার কতকগুলি বাড়ী একেবারে মহানন্দার সঙ্গে গাঁথিয়া উঠান হইয়াছে। এই সহরটী পাঁচ অংশে বিভক্ত। ১। কাটরা ২। মোগলটুলি ৩। শর্ব্বরী

৪। শাকমোহন ৫। বাঁশহাটা। এ সহরের সর্ব্বত্রই ভদ্র লোকের বাস। অধিকাংশই অবস্থাপন্ন এবং ব্যবসাদার। এখানে দুইটী ষ্টিমার ঘাট আছে। একটীতে রাজমহাল ষ্টিমার লাগিয়া থাকে এবং অপরটীতে আই, জি, এন কোম্পানির ষ্টিমার লাগিয়া থাকে। এখানে মালের জন্য একটী স্বতন্ত্র রেলষ্টেশন সাইডিং আছে। মালদহের কাটরা-দুর্গ হইতেই প্রাচীন কীর্ত্তির আরম্ভ। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার অবস্থা যখন ক্রমে হীন হইতে লাগিল সেই সময় অধিকাংশ হিন্দু আসিয়া এই পুরাতন মালদহ সহরে বসতি করেন।*

মালদহের প্রাচীন কীর্ত্তি গুলির মধ্যে জুম্মা মসজিদটী সবিশেষ প্রসিদ্ধ এবং উল্লেখ যোগ্য। উহা সম্রাট আকবরের সময় নির্ম্মিত। কেহ কেহ বলেন মাসুম নামক একজন বণিক কর্ত্তৃক এই মসজিদটী ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মসজিদটী যেখানে নির্ম্মিত তাহার নাম মোগল টুলি।

অনেকে অনুমান করেন যে কাটরা দুর্গ কোন সময়ে বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের আশ্রয় স্থান ছিল।

* গৌড়ের বিষয় লিখিতে হইলে পুরাতন মালদহ ও পাণ্ডুয়ার বিষয় উল্লেখ না করিলে অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

কাটরার দক্ষিণস্থিত উচ্চভূমি খনন করিলে অনেক মণিমুক্তা জহরত প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে এমন অনেকের ধারণা। এই নগরে অতি পূর্ব্বকালে অনেক মুসলমান বাস করিত সেইজন্য হিন্দু পল্লীতেও মুসলমানের সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ফুটা মসজিদ নামক আর একটা মসজিদ আছে। এই মসজিদটা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে মজমসের দিল খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এখন ইহা একেবারে ভগ্নদশায় পরিণত। কাটরা দুর্গের নির্ম্মাণসম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাহাতে ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে ফিরোজসা যখন লিয়াজসার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্যগণ সহ এখানে ছাউনি করিয়াছিলেন সেই সময়ে মাসুম সদাগর কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফিরোজ সা এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন এ জন্যই ইহার অপর নাম ফিরোজপুর। নদীর পশ্চিম পারে নিমাসরাই গ্রামে যে একটি ভগ্নাকার স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে তাহার সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম মত। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বকালে চোর ডাকাত ও দস্যুর ভয় এদেশে খুবই ছিল সেইজন্য এখানে আলোক, প্রহরী ও ঘণ্টার বন্দোবস্ত ছিল, আবার কেহ বলেন শত্রুগণকে

আসিতে দেখিলে গৌড়ে সংবাদ দেওয়ার জন্য এখানে প্রহরী বন্দোবস্ত ছিল, আবার কেহ বলেন মৃগয়া করিবার সুবিধার্থে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফলকথা প্রথম ও দ্বিতীয় কারণই কতকটা সম্ভব পর। ইহার সমান আর একটা স্তম্ভ নাকি অপর পারে ছিল। তাহার চিহ্ন এখন নাই। ইহা যে কত উচ্চ ছিল তাহা বলা যায় না। ঠিক কালিন্দি ও মহানন্দার সঙ্গম স্থলে এই স্তম্ভ স্থাপিত। ইহার নাম নিমাসরাই স্তম্ভ। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের সময়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে একটা সরাই ছিল। সেই সরাইটা মাসুম সদাগরের ভ্রাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এমত শুনা যায়। নিমাসরাই রেলষ্টেসনের একমাইল পূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড দাঘি আছে তাহাকে ঠাকুরবাড়ী দাঘি বা পারা পুকুর বলিয়া থাকে। ইহার জল অতি নির্ম্মল। ইহাতে অনেক বড় বড় মাছ এবং কুম্ভীর আছে। ইহার সম্বন্ধে একটা গল্প আছে, পূর্ব্বকালে কোন সদাগর লক্ষ টাকার পারা বিক্রয় করিবার জন্য মালদহ আসিয়াছিল। তাহার পারা বিক্রয় হইল না বলিয়া সে বলিয়াছিল যে, মালদহের নাম শুনিয়া বড় আশা করিয়া

আসিয়াছিলাম কিন্তু আমার পারা এখানে কেহ কিনিতে পারিল না। এক ধোপানী তখন এই পুকুরে কাপড় কাচিতেছিল সে ইহা শুনিয়া তাহার জন্মভূমির কলঙ্ক হয় মনে করিয়া সমুদয় পারা কিনিয়া ঐ পুকুরে ঢালিয়া দিল। সেই হইতে ইহার নাম পারাপুকুর হয়। এই পুরাতন মালদহের পূর্ব্বদিকে ধর্ম্মকুণ্ড নামক এক বৃহৎ জলাশয় আছে। এই জলাশয়ের সঙ্গে মহানন্দার যোগ আছে। ইহার নিকট আর একটা পুষ্করিণী আছে তাহার নাম দেবকুণ্ড, কেহ কেহ অনুমান করেন * ধর্ম্মপাল ও দেবপালের নাম হইতে এই ধর্ম্মকুণ্ড ও দেবকুণ্ড নাম হইয়াছে। ইহার এক মাইল উত্তর হইতে বেহুলা নদী নামক একটী ক্ষুদ্র নদী বাহির হইয়া মাধাইপুরের ভিতর দিয়া টাঙ্গন নদীতে মিশিয়াছে। বেহুলা লক্ষিণদরের মৃতদেহ

---

* ধর্ম্মপাল দেবের একখানি তাম্রশাসন ১৮৯৩ খৃঃ নভেম্বর মাসে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী ভোলাহাট থানার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামে এক কৃষক পল্লীর নিকট পাওয়া যায়। মালদহ জেলার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। পাল বংশীয় রাজগণের গৌড় ও পাণ্ডুয়ার রাজত্ব বিবরণ এই তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ আছে।

লইয়া ভাসিতে ভাসিতে কালিন্দী নদী হইয়া এই নদীতে আসিয়াছিলেন। সেই হইতে ইহার নাম বেহুলা নদী হইয়াছে এমত জনশ্রুতি। নিমাসরাই রেলষ্টেসনের ৩।৪ রশি পরিমাণ উত্তরে এই বেহুলা নদীর উপরে একটী লোহনির্ম্মিত পুল আছে; সেই পুলের উপর দিয়া রেলগাড়ি যাতায়াত করে।

পাণ্ডুয়ার বিবরণ

মালদহ হইতে ই, বি, রেলওয়ের আদিনা এবং একলাখী উভয় ষ্টেসন হইতেই পাণ্ডুয়া যাওয়া যায়। পাণ্ডুয়ার উত্তর সীমানা রায়খাদীঘি বা দীঘিহাট, পূর্ব্ব সীমানা আদিনা মসজিদের প্রায় এক মাইল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, পশ্চিম সীমানা মহানন্দা নদী পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণ সীমানা সমসাবাদ পর্য্যন্ত। পাণ্ডুয়া দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় আট মাইল হইবে। পাঠকগণ এই পাণ্ডুয়াকে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া বলিয়া ভুল করিবেন না। তাহা হইতে পৃথক করিবার জন্যই বোধহয় লোকে মালদহ জেলার এই পাণ্ডুয়াকে "হজরত-পাণ্ডুয়া" বলিয়া থাকে। ইহার অধিকাংশ রাস্তাই একেবারে ইঁট দিয়া বাধা ছিল। পাণ্ডুয়াতে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেববেবীর মূর্ত্তির

নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়। ছোট বড় পুষ্করিণীর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই গুলি যে হিন্দুরাজ গণের আমলে খনিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দু দেবালয়ও এখানে অনেক ছিল এবং সেই সমুদয় হিন্দু কীর্ত্তি নষ্ট করিয়া বর্ত্তমান মসজিদ গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

অতি প্রাচীনকালে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামে একটা হিন্দু নগর ছিল। কেহ কেহ বলেন যে এই পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পাণ্ডুয়া নাম হইয়াছে। সে যাহাই হউক পাণ্ডুয়া যে একটী হিন্দুনগর ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। *আদিশূর রাজা সর্ব্বপ্রথমে গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করেন। তিনি একাদিক্রমে ৭৫ বৎসর কাল রাজত্ব

* আদিশূর রাজার বিষয় কেবলমাত্র বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকার ঐতিহাসিক অংশে পাওয়া যায়। তাঁহার সময়ের কোন তাম্র-শাসন, শিলালিপি বা মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। ভট্ট-ভবদেবের প্রশস্তি পাঠ করিলে আদিশূর নামে যে কোন রাজা ছিলেন এমত বোধ হয় না। আদিশূর রাজার সর্ব্বপ্রথমে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার রাজত্ব বিষয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৌড়ের ইতিহাস হিন্দু রাজত্ব হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

করিয়াছিলেন। আদিশূর রাজার রাজত্বের প্রারম্ভে পাণ্ডুয়াতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমধিক প্রচলন ছিল এবং তৎকালে গৌড় পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত ছিল। আদিশূর রাজাই পাণ্ডুয়াতে প্রথম হিন্দু ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তিনি ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ ছান্দড় ও বেদগর্ভ নামক পঞ্চ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বপ্রথমে পাণ্ডুয়াতে আনয়ন করেন। পাণ্ডুয়াতে দুইটী অতি পুরাতন দীঘি আছে একটীর নাম হোমদীঘি ও অপরটীর নাম ধূমাদীঘি। এই উভয় দীঘির তীরে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ইহাদের নামকরণ ঐরূপ হইয়াছে এমত এখনও লোকে বলিয়া থাকে। * শূর বংশীয় এগার জন হিন্দু রাজা একাদিক্রমে সাত শত চৌদ্দ বৎসরকাল গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপর পাল বংশীয় রাজগণ ছয়শত অষ্টানব্বই বৎসর কাল রাজত্ব করেন তৎপর সেন বংশীয় রাজগণ গৌড় ও পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসরকাল বল্লালসেন গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করেন। বল্লালসেনের রাজত্ব

* শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৌড়ের ইতিহাস হিন্দু রাজত্ব হইতে উদ্ধৃত।

কালেই প্রথমে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার দুর্গ নির্ম্মিত হয়। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিদ্বেষী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি করিয়া গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে যাহাতে হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতি সাধন হয় এজন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।* তখন ভাগীরথী নদী পাণ্ডুয়ার পূর্ব্ব-দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া রাণীগঞ্জ, বারোডাঙ্গা ও মাধাইপুরের নিকট দিয়া মুচিয়ার দক্ষিণ সীমানা হইতে মহানন্দা নদীতে মিলিত এবং তৎপর গৌড়ের পূর্ব্ব প্রান্তে অধুনা পরিচিত ভাতিয়া ও গুলদহের বিলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। লোকে এখন যাহাকে মাধাইপুরের বিল, ভাতিয়ার বিল ও গুলদহের বিল বলিয়া থাকে বাস্তবিক পক্ষে এইগুলি আদৌ বিল ছিল না। ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই-গুলি তাহারি পরিত্যক্ত জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গৌড় ও পাণ্ডুয়া হইতে হিন্দু রাজগণের কীর্ত্তি

*Stewart's History of Bengal, page 38. In A. D. 1243 the Ganges ran through Gaur, the Citadel being on the west side.

বিলুপ্ত হইলেও যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহাতে তাঁহাদের নাম একেবারে বিলুপ্ত হইবার উপায় নাই।*

বর্ত্তমান পাণ্ডুয়ায় প্রবেশ করিতে হইলে প্রথমে সেলামী দরজা পাওয়া যায়। লোকে বলে এখানে শা জালাল বাস করিতেন। এইখানে দরজার উপরে আরবী অক্ষরে "ইয়া আল্লাহো ওশাহ জালাল" কথাটি লিখিত আছে। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে† বাইশ হাজারীর কাছারী বা বড় দরগা বা মসজিদ অবস্থিত। এই মসজিদের পূর্ব্ব ভাগে চাঁদ খাঁ কোতোয়ালের কবর আছে। এইখানে একটী বৌদ্ধ মন্দির এবং একটী হিন্দু মন্দির ছিল এমত লোকে বলিয়া থাকে কিন্তু তাহার কোনই নিদর্শন নাই। এই বড় দরগার মধ্যে ছোট একটী পুকুর আছে। এই পুকুরে অসংখ্য মাছ আছে কিন্তু লোকে কখনও ইহার মাছ ধরে না, কারণ প্রবাদ এইরূপ যে এই পুকুরের মাছ ধরিবে তাহারই মৃত্যু হইবে। এই

---

* অধুনা পাণ্ডুয়াতে দেখিবার জিনিষের মধ্যে ছোট দরগা ভাণ্ডার খানা, তন্দুর খানা, সোণা মসজিদ একলাখী মসজিদ আদিনা মসজিদ, সেকেন্দের শাহার কবর ও সাতাশ ঘরা।

† Mr. Blockman's J. B. A. S. Vol. XLII, Part 1, Page 260.

পুকুর সন্নিকটে একটী দালান আছে, লোকে ইহাকে লক্ষণসেনী দালান বলে। ইহার নিকট ভাণ্ডারখানা ও তন্দুরখানা নামক আরও দুইটি দালান আছে। এই ভাণ্ডারখানার দালানটি নাকি চাঁদখাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এমত লোকে বলিয়া থাকে। আর তন্দুরখানাতে একটি চূলা আছে, লোকে ইহাকে শাহ জালালের চূলা বলিয়া থাকে। বড় দরগা হইতে কিছু উত্তর পশ্চিম কোণে আর একটি দরগা আছে, ইহাকে ছোট দরগা বা ছ'হাজারা বলে। এই ছোট দরগার নিকট মিঠাতালাও নামক একটি পুষ্করিণী আছে। এইখানে একটি প্রকাণ্ড আকারের তাম্র নির্ম্মিত ডঙ্কা আছে। ঐ ডঙ্কাটি নাকি মুর্শিদাবাদের নবাব মীরকাশীম কর্ত্তৃক এই ছোট দরগায় প্রেরিত হইয়াছিল। এই ছোট দরগার ধ্বংসাবশেষমধ্যে একটি বৃহৎ জল-নির্গমন পথ দৃষ্ট হয়। এইখানে হিন্দু বা বৌদ্ধদিগের সময়ের একটি অতি পুরাতন প্রস্তরখণ্ড আছে। প্রাচীরের বাহিরে আলায়ুন হকের একটি কবর আছে। ইহার সন্নিকটে নুর কুতুব আলমের সমাধির সংলগ্ন একখানি প্রস্তর ফলকে কতকগুলি কোরাণের বচন লেখা আছে।

মুকদুমশাহ জালাল উদ্দিন ও নূরকুতুবের সময় হইতে পাণ্ডুয়া মুসলমানদের তীর্থস্থান হইয়াছে। পাণ্ডুয়াতে দুইটি মেলা হইয়া থাকে ইহার একটিকে বাইসির মেলা বলে ও অপরটিকে ছোট দরগার মেলা বলে। শাজালালের মৃত্যু উপলক্ষে আরবি মত হিসাবে রজব চন্দ্র মাসের ২২শে তারিখে বড় দরগায় এই মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমান সমবেত হইয়া থাকে এবং মেলা চারি পাঁচ দিন মাত্র স্থায়ী হয়।

অপরটি মুসলমানগণের রোজার পনর ষোল দিন পূর্ব্বে ছোট দরগায় এই মেলা লাগিয়া থাকে। (আরবি চন্দ্র মাস) সাবানের ১৩।১৪ তারিখে নূর কুতুব আলমের মৃত্যুর স্মরণ উৎসব উপলক্ষে এই মেলা হইয়া থাকে। সাত দিন পর্য্যন্ত এই মেলা থাকে।

ছ'হাজারী দরগার কিছু উত্তরে ৮০ ফুট দৈর্ঘ্যে একটি সমচতুষ্কোণ মসজিদ আছে, ইহাকে কুতুবশাহী মসজিদ বা সোণা মসজিদ বলিয়া থাকে। ইহা ইটের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাচীরের দরজাগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত। প্রাচীরটি ৭।৮ ফুট

আন্দাজ পুরু হইবে। ইহা দুইটি দরদালানে বিভক্ত হইয়াছে এবং বার কোণবিশিষ্ট থামে ইহা পৃথক হইয়াছে। ইহার উপরে দশটি গম্বুজ অবস্থিত। গম্বুজগুলি অতি সুন্দর রঙ্গীন ইটের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মসজিদটি মোগল রাজত্বের সম-সমকালে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজা গণেশের পুত্র যদু জালাল উদ্দিনের সময়ে এইখানে একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ভিতরে অষ্টকোণী এবং ইহার প্রত্যেক কোণে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত অষ্টকোণী থাম আছে। ইহার ভিতরে তিনটি কবর আছে। মধ্যের কবরটি স্ত্রীলোকের ও অপর দুইটি পুরুষের। ইহার ভিতর ভাগে অতি চমৎকার কারুকার্য্য আছে। এই মসজিদটির নাম * একলাখী মসজিদ। কেহ কেহ বলেন যে এই মসজিদ নির্ম্মাণকালে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এজন্য ইহার নাম একলাখী মসজিদ হইয়াছে। এই একলাখী মসজিদ হইতে দুই মাইল পশ্চিমে দিনাজপুর যাইবার রাস্তার দক্ষিণ ধারে যে একটি প্রকাণ্ড মসজিদ দেখিতে

* Archaelogical Survey report Vol. III. Page 11.

পাওয়া যায়, তাহার নাম * আদিনা মসজিদ। এত বড় মসজিদ আর কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ। এই প্রকাণ্ড সুন্দর চতুষ্কোণ মসজিদের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৫০৮ ফুট এবং বিস্তার পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৩০০ ফুট হইবে। ইহার পশ্চাৎ দিকে দুইটি খিড়কী দরজা আছে। আর সম্মুখে একটি মাত্র ছোট প্রবেশ দ্বার আছে। মসজিদটির স্থানে স্থানে পড়িয়া গিয়াছে। স্থানীয় লোকে বলে এক লক্ষ লোক সমবেত হইয়া এই মসজিদে নামাজ করিতে পারে। তবে এক লক্ষ লোক না হইলেও দশ বারো হাজার লোক ইহার মধ্যে নামাজ করিতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই মসজিদটি একুশটি স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত। স্ত্রীলোকদের বসিবার জন্য যে ইহার মধ্যে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল তাহা সহজেই বোধগম্য হইয়া থাকে। ইহার প্রবেশ-দ্বারের উপরিভাগে একটি প্রস্তর খণ্ডে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি খোদিত ছিল, তাহার কতক অংশ ঘসিয়া ঘসিয়া তুলিয়া তাহাতে চুণ ও বালি দেওয়া হইয়াছিল এমত বোঝা যায়। এই মসজিদ নির্ম্মাণের যাবতীয় মাল

* J. B. A. S., Vol. XLII, Part 1, Page 256 & 257.

মসলা হিন্দু কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে ইহা সেকেন্দরশাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদে সর্ব্বসাকুল্যে ৩৭৮টি গম্বুজ ছিল। ইহার সংলগ্ন উত্তরভাগে সেকেন্দরশাহার কবর আছে। এই গৃহের দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান। এখন ইহার অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এই আদিনা মসজিদের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্বভাগে সাতাইশঘরা নামক একটি স্থান আছে। এই সাতাইশঘরাকেই লোকে সেকেন্দরশাহার প্রাসাদ বলিয়া থাকে। এখন ইহার স্নানাগার মাত্র আছে। ইহার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড অস্টকোণবিশিস্ট দালান আছে। ইহার আটদিকে আটটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরী দেখা যায়। ইহার অন্যান্য অংশ এখন ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে একটি ২০০ হাত দীর্ঘ ও ১০০ হাত প্রস্থ পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীটি হিন্দু আমলের। ইহা রাজা গণেশের সময়ে খনিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আদিনা মসজিদ ও সাতাইশঘরার মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটি গড়বেষ্টিত স্থান আছে। এখন এই

স্থান কেবলমাত্র ভগ্ন ইষ্টকস্তূপে পরিপূর্ণ। সেকেন্দর শাহের সময়ে এইস্থানে পাণ্ডুয়ার দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে এই স্থানের চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত জঙ্গল এবং ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পাণ্ডুয়ার মধ্যে এই স্থানটিতে সময় সময় বড় বড় ব্যাঘ্র বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছে। গৌড়ের ন্যায় পাণ্ডুয়ার প্রত্যেক দীঘি এবং এমন কি ছোট ছোট পুষ্করিণীতে পর্য্যন্তও যথেষ্ট কুম্ভীর দেখিতে পাওয়া যায়।

সমাধি।

গৌড় ও পাণ্ডুয়াতে কতকগুলি সমাধি আছে তন্মধ্যে অধিকাংশই মসজিদ সংলগ্ন। মসজিদের বর্ণনায় ফতেখাঁ, হোসেন সা, নশরত সা, উমরকাজি, জুলকরয়ণ, নিয়ামৎউল্লা, সেকেন্দর সা, * ফকির আলায়ুল-হক, নুর কুতুব, যতুজালাল উদ্দিন ও সামাসউদ্দিন প্রভৃতির সমাধি স্থানের বিষয় লিপি বদ্ধ করা হইয়াছে। তৎকালে সমাধির জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাদশাগণের এবং বড় বড় পীরগণের

* Mr. Blockman's J. B. A. S. Vol XLII. Part I. Page 221 and 226.

সমাধিস্থান কতকটা ইচ্ছানুযায়ী এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দ্দেশ করা হইত বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি সমাধি সংলগ্ন প্রস্তরখণ্ডে সমাধির বিবরণ আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আবার এমন অনেকগুলি সমাধি স্থান আছে যাহার কোন বিবরণ পাইবার উপায় নাই। অধিকাংশ সমাধি স্থানই কষ্টি পাথর দ্বারা নির্ম্মিত। ছোট সোনা মসজিদ বা খোজাকা মসজিদ সন্নিকটে পূর্ব্বদিকে তিনটি কষ্টিপাথর নির্ম্মিত সমাধি স্থান ছিল। ইহার মধ্যে এখন দুইটি মাত্র আছে এবং অপরটি ১৮৮৫ সনের ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে দুইটি আছে তাহার একটি ওয়ালি-মহম্মদের এবং অপরটি আলির সমাধি। তৃতীয় সমাধিটা ভূমিকম্পে যখন ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল তখন উহার মধ্য হইতে একখানি জরার শাল ও কতকগুলি খণ্ডাকৃত প্রস্তর খণ্ড বাহির হইয়াছিল; সেই জরার শাল ফিরোজপুর, চাঁদনি ও মিলিক প্রভৃতি গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকগণ ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে অর্থাৎ ভূমিকম্পে এই সমাধি প্রস্তর ভাঙ্গিয়া যাইবার অব্যবহিত পরে একদিন সন্ধ্যার সময় কয়েকজন লোক সেই ভগ্ন সমাধিগাত্রে দীপ্ত আলোক দেখিতে পায়,

এবং সেই আলোক দেখিয়া উহারা ভূতের আলো মনে করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইয়া গ্রামস্থ লোকের নিকট এই ঘটনা প্রচার করে। পরদিন সন্ধ্যার সময় দশ বার জন লোক জুটিয়া আবার ঐ স্থানে আইসে এবং পূর্ব্ব দিনের ন্যায় দীপ্ত আলোক দেখিতে পায়। আলোক দেখা মাত্রই উহারা সকলে মিলিয়া সেই ভগ্ন সমাধির নিকট গিয়া দেখিতে পায় যে সমাধির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড হইতে এইরূপ আলোক জ্বলিতেছে। তার পর ঐ পাথরগুলি লইয়া উহারা বাড়ী চলিয়া আইসে। এবং গ্রামের লোকদিগকে দেখায়। গ্রামের লোকেরা উহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বলে যে, এ পাথরগুলি যে তোমরা চুরি করিয়া আনিয়াছ ইহা গভর্ণমেণ্ট জানিলে তোমাদিগকে ফৌজদারীতে সোপারর্দ্দ করিয়া সাজা দিতে পারে। সেই ভয়ে উহারা সমস্তগুলি পাথর জলে ফেলিয়া দিয়াছিল।

Captain Adams সাহেব ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের একটী সমাধি খনন করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে মৃত ব্যক্তির সন্নিকটে একটা ধূপ জ্বালিবার পাত্রে, দুইটি পানদানি, দুইখানি অসি ও একটি প্রদীপ জ্বালিবার পাত্র রহিয়াছে। সমাধিটি বহুশতাব্দী পূর্ব্বের এজন্য উক্ত

জিনিষগুলি অতি পুরাতন হইয়া গিয়াছিল এবং বিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। গৌড়ের প্রসিদ্ধ পীর আখিসিরাজুদ্দিন ওসমানের সমাধিস্থান বড় সাগর দীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এই আখিসিরাজুদ্দিন একজন পরম ধার্ম্মিক সাধু পুরুষ ছিলেন। গৌড়ের বাদশাগণ ইঁহার শিষ্য ছিলেন। এই সমাধির উপরে একটা চতুষ্কোণ দালান আছে। ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে আখিসিরাজের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর নশরত শাহা কর্ত্তৃক ১৫১০ খৃষ্টাব্দে এই দালানটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পাণ্ডুয়ার বড় দরগার বহিঃপ্রাঙ্গনে চাঁদ খাঁ নামক এক ব্যক্তির সমাধি আছে। কিন্তু এই চাঁদ খাঁ যে কে ছিল তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে এই সমস্ত সমাধিতে সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এখন সে ব্যবস্থা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। গৌড়ের মধ্যে * নিয়ামতউল্লা ও ফতে খাঁর সমাধিতে এবং পাণ্ডুয়ার মধ্যে † নূরকুতুব ও ফকির আলায়ুন হকের সমাধিতে এখনও প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দেওয়া হইয়া থাকে।

* হজরত পীর শাহ্ নেয়ামতউল্লা ওলি।

† হজরত পীর নূরল আলম কুতবে আখেরজ্জমান্।

লক্ষ্মণ সেন।

বস্তুতপক্ষে লক্ষ্মণ সেনের সঠিক জন্ম তারিখ নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে যতদূর জানা যায় তাহাতে যে বৎসর বল্লালসেন মিথিলায় যুদ্ধ যাত্রা করেন সেই বৎসরই লক্ষণ সেনের জন্ম হয়। লঘু ভারতকার লিখিয়াছেনঃ—

"মিথিলে যুদ্ধ যাত্রায়াং
বল্লালেহ ভূদ্মিতধ্বনিঃ।
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষ্মণো
জাতবানসৌ।"

বল্লালসেন শেষ বয়সে তাঁহার একমাত্র পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অভিলাষ করেন এবং যথাকালে অভিষেক কার্য্য সমাপন করিয়া পুত্রের প্রতি যাবতীয় রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করেন এবং ইহার কিছুদিন পরেই বল্লাল সেনের মৃত্যু হয়। * লক্ষ্মণ সেন দেবের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে—একটী নূতন অব্দ

---

* Indian Antiquary Vol. XIX p. 1.

গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা 'লক্ষ্মণাব্দ,' লক্ষ্মণ সংবৎ বা 'লসং', নামে পরিচিত। মুসলমান বিজয়ের পরে এই অব্দ বহুকাল মিথিলায় ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং শুনিতে পাওয়া যায় যে বর্ত্তমান সময়েও ইহা সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।* জগদ্বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্বর্গীয় ডাক্তার কিলহরণ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে এই অব্দ ১১১৮--১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গণিত হইতেছে।

১১৬৯ খৃষ্টাব্দে পিতা বিদ্যমানেই লক্ষ্মণ সেন রাজা হইয়া তাহার প্রিয় রাজধানী গৌড় নগরের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে দীর্ঘিকা খনন, বিদ্যালয় স্থাপন, বিগ্রহ মন্দির স্থাপন ও পূজার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তিনি রাজধানীকে শত্রু হস্ত হইতে নিরাপদে রাখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে গড়বন্দি করিয়া উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত করিয়ছিলেন এবং অসংখ্য অট্টালিকায় শোভিত করিয়াছিলেন। গৌড়নগর ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। রাজা লক্ষ্মণসেন এই ভাগীরথী সংলগ্ন

* বাঙ্গলার ইতিহাস প্রথম ভাগ ২৯৯ পৃষ্ঠা—শ্রীরাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত।

একটা সুবৃহৎ খালখনন করিয়া রাজধানীর মধ্যে গঙ্গারজল প্রবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই খালকে কেহ কেহ এখনও "লক্ষ্মণ সেনের খাড়ী" বলিয়া থাকেন। তাহার উপর এখনও দুইটী প্রস্তর নির্ম্মিত সাঁকো বিদ্যমান আছে লোকে উহাকে "পাঁচখিলানো সাঁকো" বলে।

লক্ষ্মণসেন একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পিতা বল্লালসেন দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। একখানির নাম 'দানসাগর' ও অপর খানির নাম 'অদ্ভুত সাগর'। দানসাগর গ্রন্থখানি বল্লালসেন স্বয়ং সমাপ্ত করেন কিন্তু অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ কতকাংশ লিখা হইবার পর বল্লালসেনের মৃত্যু হয়। বল্লালসেন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে লক্ষ্মণ সেনের প্রতি এই অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ সমাধা করিবার ভার অর্পণ করেন। লক্ষ্মণসেন স্বয়ং এই গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশের রচনা শেষ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন সদা সর্ব্বদাই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বেষ্টিত থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। ইঁহার সময়ে জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, উমাপতিধর, ধোয়ী কবিরাজ, শূলপাণি, নারায়নদত্ত ও পুরুষোত্তমদেব প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ ইঁহার সভায় বিরাজ করিতেন, এই পুরুষোত্তম দেব লক্ষ্মণ সেনের আদেশ ক্রমে

"ত্রিকাণ্ড শেষ" নামক একখানি অভিধান প্রনয়ণ করিয়াছিলেল। *

লক্ষ্মণসেন দুই বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম পত্নীর নাম শ্রীমতী বসুদেবী ও শেষবয়সের পত্নীর নাম বল্লভা। লক্ষ্মণসেনের তিন পুত্র ছিল। মাধবসেন, কেশব সেন ও বিশ্বরূপসেন। হলায়ুধ মিশ্রের জেষ্ঠভ্রাতা পশুপতি ইঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

তৎকালে বঙ্গদেশে সেন রাজগণ বৈদ্যজাতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধছিলেন কিন্তু সেন রাজাগণের তাম্র শাসনে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতি লেখা হইয়াছে। বল্লালসেনের শিক্ষক গোপালভট্ট "বল্লালচরিত" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থের এক স্থানে লেখা আছে যে "বৈদ্য বংশাবতংস সোঽয়ং বল্লালনৃপপুঙ্গবঃ"। লক্ষ্মণসেন অনেক সময়ে গৌড় ও বিক্রমপুরের শাসন সংরক্ষণ ভার পুত্রগণের প্রতি ন্যস্ত করিয়া তীর্থবাস মানসে নবদ্বীপে বাস করিতেন এবং এই নবদ্বীপকে কালে একটি প্রধান নগরে পরিণত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়া

* সেক শুভোদয় নামক হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ যাহা পাণ্ডুয়ার মসজিদে পাওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে উদ্ধৃত।

থাকেন যে লক্ষ্মণসেন গঙ্গা স্নান করিবার জন্য নবদ্বীপে বাস করিতেন। ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না, কারণ তৎকালে গৌড়ের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। সুতরাং গঙ্গা তাঁহার নিজ বাড়ীর অতি-সন্নিকটে থাকিতে তিনি গঙ্গা বাস করিবার জন্য নবদ্বীপে থাকিবেন কেন? নবদ্বীপ তখন ও তীর্থ স্থান ছিল এবং অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত মণ্ডলী তথায় বাস করিতেন। লক্ষ্মণসেন শেষ বয়সে এই সমস্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালাপে ও ধর্ম্মালোচনায় জীবন অতিবাহিত করিবার মানসেই নবদ্বীপে অবস্থান করিতেন বলিয়া বোধ হয়। *

---

* নবদ্বীপে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী সম্বন্ধে নানা প্রকার মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে, লক্ষ্মণসেনের স্বতন্ত্র রাজধানী, "বিজয়পুর" ও "লক্ষ্মণাবতীর" উল্লেখ পাওয়া যায়। "পবনদূতে" ধোয়ীকবি একস্থানে লিখিয়াছেন যে

স্কন্ধাবারং বিজয়পুরামত্যুন্নতাং রাজধানীং। "প্রবন্ধচিন্তামণি" গ্রন্থে মেরুতুঙ্গ আচার্য্য লিখিয়াছেন,—"গৌড়দেশে লক্ষ্মণাবতী নগরে—লক্ষ্মণসেন নামক রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিম্বদন্তী অনুসারে, লক্ষ্মনাবতী বা গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের সমীপবর্ত্তী বিশাল সাগর দীঘি লক্ষ্মণসেন খনন করাইয়া ছিলেন; এবং সাগর দীঘির অনতিদূরস্থিত একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও

নবদ্বীপের উত্তরে বল্লালদীঘি নামক একটী দীঘি আছে। লক্ষ্মণসেন এ অঞ্চলে এই দীঘিটি তাঁহার পিতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য খনন করাইয়াছিলেন লোকে এমত বলিয়া থাকে।

"বল্লালগড়" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। লক্ষ্মণসেনের অপর রাজধানী "বিজয়পূর" মিনহাজুদ্দীন কর্ত্তৃক "নোদিয়াহ্" নামে অভিহিত হইতে পারে। "পবনদূতের" প্রকাশক প্রবীন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "নোদিয়াহ" এবং "নদীয়া" অভিন্ন মনে করিয়া, নদীয়াই বিজয়পূর এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। রাজসাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়া সহরের ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কুমার রাজার রাজধানী "কুমারপুরের" নিকটবর্ত্তী বিজয় রাজার রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষপূর্ণ "বিজয়নগরই" পবনদূতের "বিজয়পূর" বলিয়া বোধ হয়। বিজয়সেনের নামানুসারে যে বিজয়পূরের নামকরণ হইয়াছিল, সে বিষয়ে সংশয় নাই, এবং "বিজয়নগরেও" জনশ্রুতি অনুসারে এক বিজয় রাজা ছিলেন। দান সাগর মতে বিজয়সেনের প্রাদুর্ভাব-স্থানে [বরেন্দ্রই] "বিজয়নগর" অবস্থিত, এবং ইহার ৭ মাইল ব্যবধানে বিজয়সেনের শিলালিপির প্রাপ্তিস্থান "দেবপাড়া" অবস্থিত। দেবপাড়ার "পদুমসহর" নামক হ্রদ বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের স্মৃতি এখনও জাগ্রত আছে এবং "পদুমসহরের" তীরে একটী বৃহৎ দেব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। সুতরাং বিজয়নগরকে

লক্ষ্মণসেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা পুণ্ডরিকনামক এক প্রকার জাতি গৌড়ে আনয়ণ করেন। আজিও তাঁহাদের বংশধরগণ মালদহ জেলার মহদীপুর, ভোলাহাট, জোত, ও নিমাসরাই প্রভৃতি স্থানে বসতি করিতেছেন। গৌড় নগরে সর্ব্বসাকুল্যে বাইশটী বাজার ছিল। এই বাইশটী বাজারের মধ্যে মহাজনটুলী, লালবাজার, হাবাসখানা ও চাঁদনীচকের বাজার অতি প্রসিদ্ধ ছিল। লালবাজারের সন্নিকটে একটী সেনানিবাস ছিল। লক্ষ্মণসেনেনের রাজত্ব সময়ে ১১৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জয়চন্দ্র কনৌজের রাজা ছিলেন। কুতুবুদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে জয়চন্দ্রের মৃত্যু হয়। জয় চন্দ্রের মৃত্যুর পর মুসলমানগণ কনৌজ অধিকার করেন এবং মগধের পশ্চিম সীমা

বিজয়পুর বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ হয়। বিজয়নগর লক্ষ্মণাবতীর ভগ্নাবশেষ হইতে ৪৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত; নদীয়া ১১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। মিনহাজের বর্ণনানুসারে 'লক্ষ্মনাবতী' হইতে 'নোদিয়া' খুব বেশী দূরে ছিল বলিয়া বোধ হয় না এবং এই নিমিত্ত বিজয় নগরকেই "নোদিয়াহ" বলিতে প্রবৃত্তি হয়। শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত গৌড় রাজমালা ৭৪ ও ৭৫ পৃষ্ঠা।

পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তারের সংকল্প করেন। মগধ রাজ্য অধিকার করিবার অব্যবহিত পরই মুসলমানগণ বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিবার মানস করেন। প্রথমে বখ্তিয়ার খিলিজি ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। নবদ্বীপ অধিকৃত হইলে পর ১২০৫ খৃষ্টাব্দে গৌড় অধিকৃত হয়। নবদ্বীপ আক্রমণের সময় মুসলমান সেনাপতি বখ্তিয়ার খিলিজিকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল না। *

'নোদিয়া' যদি নবদ্বীপ হয়, তাহাহইলে বোধ হয় যে, মহম্মদ বখতিয়ার খিলিজি লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিয়া সেন-রাজের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কারণ নবদ্বীপে যে সেনবংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনই প্রমাণ অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয় নাই।

যেহেতু বখ্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপের সন্নিকটে এক জঙ্গলমধ্যে অধিকাংশ সৈন্য লুক্কায়িত রাখিয়া কতিপয় সংখ্যক সৈন্য লইয়া নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আকস্মিক আক্রমণে রাজা লক্ষ্মণসেন অনন্যোপায় হইয়া বিক্রমপুর অভিমুখে প্রস্থান করিতে

* শ্রীরাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস। প্রথমভাগ ৩২৪-৩২৫ পৃষ্ঠা

বাধ্য হন। রিয়াজ-উস-সালাতিনকার বলেন যে বখ্‌তিয়ার খিলিজি মাত্র ১৮ জন সৈন্য লইয়া নবদ্বীপ রাজবাড়ী আক্রমণ করেন। রাজা লক্ষ্মণসেন তখন আহার করিতে বসিয়াছিলেন এবং এই আক্রমণে অত্যন্ত ভীত হইয়া সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া একটী গুপ্তপথে তিনি পলায়ন করেন এবং পরে নৌকাযোগে কামরূপ যাত্রা করেন। তবকৎ-ই-নাসিরী লেখক মিনহাজের মতে রাজা লক্ষ্মণসেন জগন্নাথ ক্ষেত্রে পলায়ন করিয়াছিলেন। * নবদ্বীপের মত অত সহজে গৌড়

* মিনহাজ আর একস্থানে লিখিয়াছেন, যখন বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক বিহার আক্রমণের সংবাদ রায়লখমণিয়ার নিকট পৌঁছছিল তখন একদল জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ রাজাকে জানাইল যে পুরাকালের ব্রাহ্মণগণের পুস্তকে লেখা আছে যে এদেশ তুরস্কগণের হস্তগত হইবে; এবং এই শাস্ত্রীয় ভবিষ্যৎবাণী সফল হইবার সময়ও আসিয়াছে। সুতরাং সকলেরই এদেশ হইতে পলায়ন করা উচিত। শাস্ত্রে লেখা ছিল, আজানুলম্বিতবাহু একজন তুরস্ক এদেশ অধিকার করিবে। বখ্‌তিয়ার খিলিজি আজানুলম্বিতবাহু কিনা দেখিবার জন্য লক্ষ্মণসেন একজন বিশ্বাসীচর পাঠাইলেন; চরেরা আসিয়া বলিল মহম্মদ বখতিয়ার যথার্থই আজানুলম্বিত বাহু, যখন এই সংবাদ নোদিয়ায় প্রচারিত হইল তখন ব্রাহ্মণগণ এবং সাহাগণ

আক্রমণ হয় নাই। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় পুত্র বিশ্বরূপ

কামরূপে চলিয়া গেল কিন্তু রাজ্য ছাড়িয়া যাওয়া রায় লখমনিয়ার পছন্দ "মাফিক" হইলনা। তবে কি বঙ্গের শাসনকর্ত্তা লক্ষ্মণসেন একাকী একটী বৎসর নদীয়ায় পড়িয়া থাকিলেন? পর বৎসর মহম্মদ বখতিয়ার বিহার হইতে আসিয়া নোদিয়া আক্রমণ করিলেন। মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে ছিল। লক্ষ্মণসেন আহার করিতে বসিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ পলায়ণ করিলেন। এই হইতেই তাঁহার রাজত্বের শেষ হইল। ইদানীং অনেকেই একথা বলিয়া থাকেন যে লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষতায় বাঙ্গলা তুরষ্কের পদানত হইল। কিন্তু মিনহাজুদ্দিন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতি অক্ষর ও যদি সত্য হয় তাহা হইলে লক্ষ্মণসেনকে "কাপুরুষ" না বলিয়া, বীরাগ্রগণ্য বলিয়া পূজা করাই সঙ্গত। শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত গৌড়রাজমালা ৭৬ পৃষ্ঠা।

১। মিনহাজ গৌড়-বিজয়ের চত্বারিশৎ বর্ষ পরে নিজামউদ্দিন এবং সমসামউদ্দিন নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে বখতিয়ারের বিজয়-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিনহাজ ৬৪১ হিজিরাব্দে (১২৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতী নগরে অর্থাৎ গৌড়ে সমসামউদ্দিনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

১। বাঙ্গলার ইতিহাস প্রথমভাগ ৩২৪ পৃষ্ঠা। শ্রী রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় কৃত।

সেন তখন গৌড়ে ছিলেন। তিনি মুসলমানগণের সহিত যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াও কোন ক্রমে নগর সংরক্ষণ করিতে পারিলেন না। বাঙ্গালা দেশ মুসলমান দিগের সম্পূর্ণ হস্তগত হইল। তখনও সেন বংশীয় রাজগণের "গৌড়েন্দ্র" পদবী অক্ষুণ্ণ ছিল। এই লক্ষ্মণসেনের নাম হইতেই গৌড়ের নাম লক্ষণাবতী হইয়াছিল।

রাজা লক্ষণসেনের আমলের চারি খানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। একখানি সুন্দর বনের নিকটে, একখানি দিনাজপুর জেলার গঙ্গারাম পুর থানার অন্তর্গত তপন দীঘির নিকট, একখানি নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট থানার সন্নিকটে আন্দুলিয়া গ্রামে এবং অপরখানি পাবনা জেলার তাড়াস থানার অন্তর্গত মাধাইনগর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল তাম্রশাসনে ভূমির পরিমাণ, জমির চতুঃসীমা ও শস্যাদির মূল্য লিখিত আছে। রাজা লক্ষণসেনের একখানি তাম্রশাসনের নকল ইহাতে লিপি বদ্ধ করা গেল। এই তাম্রশাসন খানি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজ পুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গতঃ তপনদীঘির সন্নিকটে একটী পুষ্করিণী খননকালে পাওয়া গিয়াছিল।

রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্র শাসন।

ওঁ নমোনারায়ণায়।

বিদ্যুদ্ যত্র মণিদ্যুতিঃ যানিপতে র্বানেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিনী সিত শিরমালা বলাকাবর্ণিঃ।
ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপ নিহিতঃ শ্রেয়হঙ্কুরোদ্ ভূতয়ে।
ভূয়াদ্ বঃস ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ সম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ ॥১॥
আনন্দোদ্‌স্নু নিধোচকোর নিকরেদুষ্ খচ্চিদাত্যণ্ডিকী।
কহ্লারে হতমোহতা রতিপতা বেকোহ হমেবেতিধীঃ।
যস্যামী অমৃতাত্মণঃ সমুদয়ন্ত্যাশু প্রকাশাজ্জগ
ত্যত্রের্ধান পরম্পরা পরিণতং জ্যোতিশুদাশ্তাং মুদে ॥২।
সেবাবনম্র নৃপ কোটি কিরীট রোচি
রম্বুম্নসৎ পদনখদ্যুতি বন্নরীভিঃ।
তেজো বিষক্কর মুষ দ্বিষতাম ভূষন
ভূমীভূজঃ স্ফুট মথৌষধি নাথ বংশে ॥৩॥
আকৌমারবিকস্ব রৈর্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভি দের্যিশঃ
প্রলেয়ৈর রিরাজ বক্ত্র নলিন ম্লানীঃ সমুমীলয়ন্।
হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজনন ক্ষেত্রোঘ পুণ্যাবলী
শালিগ্লাম্য বিপাকপীবর গুণ স্তেষামভূদ্ বংশজঃ ॥৪॥

যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিত ভুজঃতেজ সংচরৈর্যশোভিঃ
শোভন্তে পারধি পরিনস্পাহব দিশঃ।
ততঃ কাঞ্চীলীলা চতুর চতুরম্ভোধি লহরী
পরবতোবর্বী ভর্ত্তাহজনি বিজয়সেনঃ স বিজয়ী ॥৫॥
প্রভূতঃ কলিসম্পদামনন সো বেদায় নৈকাদ্রসঃ
সংগ্রামশ্রিত জঙ্গমাকৃতির ভূদ্ বল্লালসেন সুতঃ।
মশ্চেতোময়মেব শৌর্য্য বিজয়ী
দম্ভৌষধং তৎক্ষণা দক্ষিণাচয়া শ্চকার
বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ ॥৬॥
সংভুক্তান্য দিগঙ্গনাগণ গুণাভোগ প্রলোভাদ্দিশা
মীসৈরংশ সমর্পণেন ঘটিত স্তত্তৎ প্রভাব স্ফুটৈঃ।
দোরুষ্মক্ষ পিত্তারি সঙ্গররসো রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ
শ্রীমল্লক্ষণসেন ভূপতিরতঃ সৌজন্য সীমাত জনি ॥৭॥
শশ্বদ্ বন্ধ ভয়াদ্ বিমুক্ত বিষয়াস্তেন
মাত্রে নিষ্ঠিকৃত স্বাস্তায়স্তু কথং ননাম
রিপবস্তস্য প্রয়োগাল্লুয়ম্।
বৈরাত্র প্রতি বিম্বিতেহপি নিপতৎ
পত্রে হপি চঞ্চৎতৃণে হপ্যদ্বৈতেন
যতস্ততেহপি সপরো দৈবঃপরং বীক্ষতে ॥৮॥
সখলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধা ব্যরাত

মহারাজা-ধিরাজ শ্রীবল্লালসেনপদানুধ্যাত পরমেশ্বর-পরম বৈষ্ণব পরম ভট্টারক-মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেবঃ কুশলী। সমুপগতা-শেষরাজ-রাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রাজপুত্র রাজমাতা-পুরোহিত-মহধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধি বিগ্রহিক মহা সেনাপতি মহা সমুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক-মহাক্ষ পাটলিক মহাপ্রতীহার মহাভৌরিক মহাপানুপতি মহাগণস্থ দোঃসাধিক চৌরন্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্ব গোমহিষাজাবিকা দিব্যা পৃতক-গৌল্মিক দন্তপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয় পত্যাদীনন্যাং-শ্চ সকল রাজ পদোপ-জীবি নোঽধ্যক্ষ প্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্ চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ জন পদান্ ক্ষেত্র করাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মনোত্তরান্ যথাইমানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিচ মতমস্তু ভবতাং। যথা শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি পূর্ব্বে বন্ধ বিহারি দেবতা নিকর দেয়ক্ষণ ভূম্যাঢ়াবাস পূর্ব্বানিঃ সামা দক্ষিণে নিচ উহার পুষ্করণী সীমা পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুন্তি সীমা উত্তরে মোল্লাণখাড়ি সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্তত্রস্তু দেশ ব্যবহার মলিনদেব গোপমাত্ত্ব সার ভূবহিঃ পঞ্চোন্মানা বিংশত্যুক্ত-রাঢা বাপ শতৈকাত্মকঃ সম্বৎসরেণ কপর্দ্দকপুরাণ সার্দ্ধ শতৈকোৎ পত্তিকো বিল্লহিষ্টী গ্রামীয় ভুভাগঃ সবাট বিটসঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোষরঃ সগুবাকনারিকেলঃ সদশাপরাধঃ পরিহৃত-সর্ব্ব

পীড়োহচট্ট-ভট্ট প্রবেশোহ কিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যস্তৃণ যুতি গোচর-সর্য্যন্তং হুতাশণ দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় লার্কণ্ডেয় দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় লক্ষীধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভরদ্বাজ সগোত্রায় ভরদ্বাজ-অঙ্গিরস বার্হস্পত্য-প্রবরায় শামবেদ কৌথুম শাখাচরণানুষ্ঠায়িনে হেমাশ্বরত-মহাদানাচার্য্য শ্রীঈশ্বরদেব সর্ম্মণে পুন্যেহহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীনারায়ণ ভট্টারক-মুদ্দিশ্য মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য যশোভিবৃদ্ধয়ে দত্ত হেমাশ্বরথ মহাদানে দক্ষিণাৎবে নোৎস্বজ্য আচন্দ্রার্ক ক্ষিতি সমকালং ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়েণ তাম্রশাসনী কৃতা প্রদত্তোহস্মাভিঃ। তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরে-বানুমন্তব্যং। ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরক পাতক ভয়াৎ পালনে ধর্ম্ম গৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশাসিনঃ শ্লোকাঃ।

বহুভির্ব্ব সুধাদত্তা রাজভিঃ সাগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভুমিস্তস্যা তস্য তদাফলং॥
ভূমিং য প্রতি গৃহনাতিযশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুন্যকর্ম্মানেউ নেউ নিয়তং স্বর্গ গামিনৌ॥
সদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং।
সাধষ্ঠায়াং কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥

ইতি কমলদলাম্বু বিন্দুলোলং শ্রিয় মনুচিন্ত্য মনুষ্য
জীবিতঞ্চ।
সকল মিদ মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো
বিলোপ্যাঃ ॥
• শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন নারায়ণ দত্ত সান্ধি বিগ্রহিকং।
ইহ ঈশ্বর শাসণে দূতং ব্যধতু নরনাথঃ ॥
তাং ৭ ভাদ্র দিনে ৩॥শ্রী ※

রাজা লক্ষণসেনের কনিষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ সেনের একখানি তাম্রশাসন বরিশাল জেলার কোনও পল্লিগ্রামে পাওয়া যায়। ইহার সমুদয় অংশ পাঠকরা অতীব কঠিন তবে ইহার প্রথম অংশে সেন বংশীয় রাজগণের বিষয় যাহা লিপিবদ্ধ করা আছে তাহার নকল উদ্ধৃত করা গেল :—

ইহা খলুস্কন্দ গ্রাম পরিসর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধা বারাৎ সমস্ত সুপ্রস্ত-পেত অরিরাজ বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ বিজয়সেন দেব-পদানুধ্যাৎ সমস্ত সুপ্রশস্ত্য পেত অরিরাজ-নিঃশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ বল্লাল সেন দেব-পদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেন কুল কমল-বিকাশ ভাস্কর-সোমবংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্নকর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর

পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম সৌর মহারাজা-ধিরাজ অরিরাজ মদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব পদানুধ্যাত-অশ্বপতি-গজপতি-রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুল কমলবিকাশ ভাস্কর সোম বংশ প্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণ সত্যব্রত-গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক পরম সৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভাঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ বিশ্বরূপ সেন বিজয়িনঃ।

তৎকালে লক্ষ্মণসেনকে মুসলমানগণ ঘৃণা করিয়া "রায় লখ্‌মণিয়া" বা "লছ্‌মণিয়া" বলিত। *

গৌড়রাজ বিজয়ের পরে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ যে বঙ্গদেশে স্বাধীনতা অনেক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ উস সিরাজ স্বয়ং সেকথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। †

* শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৌড়ের ইতিহাস হিন্দুরাজত্ব হইতে উদ্ধৃত।

† বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথমভাগ, ৩২৬ পৃষ্ঠা, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।